কবি করুণানিধান স্মরণিকা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
সম্পাদিত

সাহিত্যতীর্থ
৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট কলকাতা ৬

সূচীপত্র

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

সম্পাদকীয়

সাহিত্যতীর্থের প্রথম তীর্থপতি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে শ্রদ্ধাস্মরণিকা।

কবির স্মৃতি শুধুই বহুভাবে ও বহুভাষায় বলা হয় নি, শতবর্ষের পূর্তিতে কিছু পূর্বসুরির ঋণ স্বীকৃতির জন্যেই নানাজনের শ্রদ্ধাঞ্জলির সাজি নিয়ে আজ গ্রথিত হয়েছে 'কবি করুণানিধান স্মরণিকা'। বর্তমান কালের জীবিত জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে তরুণতর লেখকলেখিকারাও সশ্রদ্ধ অঞ্জলি নিবেদন করেছেন। বহুজনের রচনা নানা সময়ে নানা পত্রপত্রিকায় করুণানিধান প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সে সকল রচনায় বর্তমান গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হল না বলে মন কেমন করছে, কিন্তু উপায়ন্তর কই? সাধ আছে সাধ্য যে নেই।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ সাহিত্যতীর্থে কবির জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন হয়। বর্তমান তীর্থপতি বনফুল সভাপতিত্ব করেন এবং বর্ষব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণে বলেন—'কবির প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রেমের কবিতা রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য অবদান। সাহিত্যতীর্থে তাঁর জন্মশতবর্ষের উদ্বোধন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি জীবনের শেষপাদে গ্রহণ করেছিলেন সাহিত্যতীর্থের প্রথম তীর্থপতির গৌরব।' বনফুল বলেন—'আজকের কবিরা অধিকাংশ স্বার্থের কাঙাল, নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্যসাধনা আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না। এ দেশে কবি হয়ে জন্মগ্রহণ চরম দুর্ভাগ্য। রবীন্দ্রনাথকেও হেনস্থা সহ্য করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যদি নোবেল পুরস্কার না পেতেন, তা হলে তিনিও বিস্মৃতির তলে হারিয়ে যেতেন। আমাদের মধ্যে একজন খেলোয়াড় বা অভিনেতা যে জনপ্রিয়তা পায় একজন লেখক তা পায় না। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এত উচ্চমার্গের কবি হওয়া সত্ত্বেও আজ আমরা ভুলতে বসেছি, এটা আমাদের লজ্জার বিষয়।' করুণানিধানের সঙ্গে তাঁর একবার এক সাক্ষাতের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে বললেন—'তিনি আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন।' তাঁর সরল সাধারণ জীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে বললেন—'তিনি সাধারণ মানুষের অতি কাছের মানুষ ছিলেন। প্রকৃতি আর মাটি আর মানুষ ছিল তাঁর অতি পরিচিত। তাঁর কবিতার এক বিশেষ গুণ ছন্দের সাবলীলতা এবং প্রকৃতি বর্ণনা। শিশুর মতো সরল উন্মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন সেই মহাকবি। তাঁকে প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। সেই মহাকবিকে প্রণাম করবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। আমি সে সুযোগ পেয়েছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর বুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য ছিল

অসাধারণ, সর্বোপরি সকলকে ভালোবাসার মতো তাঁর ছিল এক বিরাট হৃদয়।' কবি করুণানিধান প্রসঙ্গে ডক্টর মদনমোহন কুমার বিচারপতি সমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ডক্টর সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল ডক্টর শুদ্ধসত্ত্ব বসু রণজিৎকুমার সেন উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক কুমারেশ ঘোষ ডক্টর শিবদাস চক্রবর্তী আলোচনা করেন। কবিতা পাঠ করেন বেলা দেবী ও অমলকৃষ্ণ গুপ্ত। এই দিন জীবিতজ্যেষ্ঠ কবিরূপে ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি কবি করুণানিধানের প্রতি জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন—'কবি অত্যন্ত বন্ধু বৎসল ও অতিথি পরায়ণ ছিলেন। অতিথিদের জন্যে তিনি বিস্কুট আনিয়ে রাখতেন এবং তাই দিয়ে সকলকে মধুর বিনয়ে আপ্যায়িত করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরোক্ষ পরিচয় সাহিত্যসূত্রে প্রথমে এবং প্রত্যক্ষ পরিচয় চিকিৎসাসূত্রে পরে হয়। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি পরীক্ষা করে দেখি যে তাঁর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার সূত্রপাত হচ্ছে। তখনই ওষুধের ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু পরে তাঁর বাড়ির লোক এসে খবর দিলে যে, কবি জিদ ধরেছেন ওষুধ খাবেন না। তখনই তো আমি প্রমাদ গুণলুম কবির জরাজীর্ণ শীর্ণদেহের জন্যে বিশেষ করে, তাই নিজেই আবার তাঁর কাছে হাজির হলুম। অনেক প্রবোধ-বাক্যে শিশুকে বোঝানোর মতো করে বুঝিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওষুধ খাইয়ে সেদিন ফিরলুম। এমন উদার অমায়িক সরল সুন্দর প্রকৃতির মানবপ্রেমিক কবিকে সহায় সম্বলহীন বিপত্নীক জীবনে কি অভাব ও অবহেলায় জীবনযাপন করতে হয়েছে যে তা মনে করে আজ সকলেই দুঃখ ও লজ্জা বোধ করবেন।' শিল্পী ভূনাথ মুখোপাধ্যায় অংকিত কবি করুণানিধানের বর্ণাঢ্য তৈলচিত্রটি 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'এর সৌজন্যে এবং পরিষৎ-সভাপতির অনুমোদনে ও পরিষৎ-সম্পাদকের সক্রিয় সহযোগিতায় স্থাপিত হয় পাথুরিয়াঘাট মল্লিকবাড়ির ঠাকুর দালানের সিংহাসনের ওপরের সম্মুখভাগে।

কবি করুণানিধানের জন্মশতবর্ষের স্মরণে সাহিত্যতীর্থ বর্ষাকালীন অধিবেশন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে তীর্থপতি বনফুল সভাপতির অভিভাষণে কবির স্মৃতিচারণ করেন। জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক ও সুধীরকুমার মিত্র আলোচনা করেন। অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় কবির কবিতা পাঠ করেন।

সাহিত্যতীর্থ চতুর্বিংশ বার্ষিকী কথাসাহিত্যিক ও কবি সম্মেলনকেও প্রথম তীর্থপতির জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি-বাসর রূপেই চিহ্নিত করা হয়। ২৭শে কার্তিক ১৩৮৪ (১৩ই নভেম্বর ১৯৭৭) অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আলোচনার উদ্বোধন করে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র বলেন—'কবি করুণানিধান সম্বন্ধে আজকে শ্রদ্ধানিবেদনের দিন, সমালোচনার দিন নয়। এটা প্রথমেই নিশানা, এই নিশানা ধরে এগোলে আমার যা নিবেদন তা আপনাদের

কাছে পৌঁছবে। করুণানিধানের কবিতায় কোন রস পাওয়া যায়? স্নিগ্ধতা সেই রস।…করুণানিধানকে আমরা শুধু রবীন্দ্র-যুগের কবি জেনেই আজকে আসর থেকে উঠে যাব না। তাঁকে সৌন্দর্যবাদের কবি বলা হয় কিন্তু আমার মনে হয় কোন কবি বা সাহিত্যিক সৌন্দর্যবাদী নন?…ইতিবাদ বা নেতি-বাদের দিক সম্বন্ধে চিন্তা আসে।…কবি করুণানিধানের প্রকৃতিতে অস্থৈর্য নেই।' ডক্টর শুদ্ধসত্ত্ব বসু বললেন—'করুণানিধান সত্যিসত্যিই সৌন্দর্যবাদী কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে সৌন্দর্যবাদ তা থেকে আলাদা। করুণা-নিধানের সৌন্দর্যবাদ স্বপ্নাবেশের বা রহস্যময়তার মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্যের ধ্যান। আধ্যাত্মিক চেতনাসহ সৌন্দর্যকে দেখবার একটা ব্যাকুলতাবোধ তাঁর সমস্ত কবিতায় আছে। যুগমানস এবং পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে কতকটা আধ্যাত্মিক করেছে। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে আবার দেশাত্মবোধও যুক্ত ছিল। তাঁরই স্ত্রী ধরাসুন্দরীর চুলের বর্ণনাও তাঁর নানা কবিতায় নারীর রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে।' ডক্টর সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'করুণানিধান এমন একজন কবি ছিলেন যাঁর কবিতায় মন শুধু ওঠে উর্ধে।' জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক বললেন—'করুণানিধান আমাদের কাছে কিছুদিন ছিলেন তাই আমার অবস্থা এখন সেই কাঠের কৌটর মতো যেমন মৃগনাভি এসে চলে গেলে যা হয় তাই।' সন্তোষকুমার দে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবনারায়ণ গুপ্ত অখিল নিয়োগী সন্তোষকুমার অধিকারী কবির বিষয়ে আলোচনা করেন। বনফুল বলেন—'কবি করুণানিধান সেই জাতের লেখক যাঁর লেখা কখনো মলিন হবে না, কখনো প্রাচীন হবে না, কখনো পুরাতন হবে না; তা চিরন্তন তা চিরসুন্দর তা চিরসমুজ্জ্বল থাকবে। এই কবি আমার লেখা পড়ে তাঁর মনে আনন্দ জেগেছিল প্রাণে আনন্দ জেগেছিল, তিনি ভাগলপুরে একদিন ছিলেন এবং আমায় আশীর্বাদ করে এসেছিলেন, সে কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। আজকে সকলে সমবেত হয়ে একজন মস্ত বড় কবিকে যে আমাদের প্রণাম নিবেদন করলাম এতেই মনে হচ্ছে আজ সন্ধ্যায় আমার জীবন অন্তত ধন্য হয়ে গেল। আমি তাঁকে আবার প্রণাম নিবেদন করছি।' করুণানিধান প্রসঙ্গে বনফুল রচিত ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, এবং হরপ্রসাদ মিত্র শুদ্ধসত্ত্ব বসু পরিমল চক্রবর্তী ও অসীম বসু স্বরচিত কবিতায়ও কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

রবিবাসরের ৪৮ বর্ষের ষোড়শ অধিবেশনে ১১ই অগ্রাণ জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক কবি করুণানিধানের জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধাজ্ঞাপক আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। স্বরচিত কবিতায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন বেলা দেবী অমলকৃষ্ণ গুপ্ত ও রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। ডক্টর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও রবিবাসারের ৪৮ বর্ষের একাদশ অধিবেশনে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গের একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও ষষ্ঠ অধিবেশনে করুণানিধানের 'বঙ্কিম-তর্পণ' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন রমেন্দ্রনাথ মল্লিক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে কবি করুণানিধান জন্মশতবর্ষ উৎসব প্রতিপালিত হয়েছে। কবির গ্রন্থরাজির প্রদর্শনীও এই উপলক্ষে করা হয়। ৭ই অগ্রাণ ১৩৮৪ পরিষদ মন্দিরের রমেশভবনের দ্বিতলের সভাগৃহে কবির বিষয়ে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র মূল বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক অভ্যর্থনা ভাষণে করুণানিধানের জীবনী সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় প্রকাশের প্রস্তাব করেন এবং গ্রন্থাবলী মুদ্রণের বিষয়েও কবির বংশধরদের কাছে সহযোগিতার প্রার্থনা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্যশাখার এক অধিবেশনে কবির জীবনীপুস্তিকা সাহিত্যসাধক চরিতমালায় প্রকাশের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রামমোহন লাইব্রেরি কবির জন্মশতবার্ষিকী সভার আয়োজন করেন ১৪ই অগ্রাণ ১৩৮৪। ডক্টর শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রধান-বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। কবি রচিত সংগীত করেন প্রদ্যোতকুমার মিত্র ও 'রাজা রামমোহন' কবিতাটি পাঠ করেন রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সভাপতি জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক কবির স্মৃতিচারণা করেন।

কবির স্বদেশবাসী শান্তিপুরে ৪ঠা ও ৫ই অগ্রাণ ১৩৮৪ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব করেন। ডক্টর সুশীল রায় সভাপতি রমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রধান অতিথি ও বিচারপতি সমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রদর্শনী উদ্বোধক রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রথম দিনে। কবি গোপাল ভৌমিক সভাপতিত্ব করেন দ্বিতীয় দিনে। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের শ্রদ্ধার্ঘ্য-তর্পণমূলক স্মারকগ্রন্থ 'করুণা-আরাত' কবির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বহু তথ্যের সংকলন। পশ্চিম বঙ্গের জেলায় জেলায় বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনে কবির জন্মশতবার্ষিকী সভা ও আলোচনাচক্র বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত হয়।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ২৮শে অগ্রাণ কলকাতায় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের মৃত্যুদিনের স্মরণসভায় ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কবি করুণানিধান ও কুমুদরঞ্জন বিষয়েই বলেন। বর্ধমানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মদিন ১৯শে ফাল্গুনে কবি কুমুদরঞ্জন ও করুণানিধান প্রসঙ্গও আলোচনা হয়।

২৩শে ফাল্গুন-৭ই মার্চ রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে তাঁদের শিবানন্দ হলে ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বের সভায় রমেন্দ্রনাথ মল্লিক কবি করুণানিধান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

আভা পত্রিকার তরফ থেকে 'কলিকাতা সাহিত্যসেবী সম্মিলনী'ও এক সভায় কবির জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করেন।

হাওড়া জেলা স্কুলে ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ (২১শে মে ১৯৭৮) কবি করুণানিধান

বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী সভার আয়োজন হয়। ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র প্রধান অতিথি রূপে ও রমেন্দ্রনাথ মল্লিক উদ্বোধক রূপে উপস্থিত ছিলেন। 'সাহিত্যবাণী' পত্রিকার কবি করুণানিধান জন্মশতবর্ষ সংখ্যাটি এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়।

'কবিতাবলী' কবিতাপত্রিকার প্রথম সংকলন কবির জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যারূপেই প্রকাশিত হয়েছে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবির বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে বিগত বছরে। সাহিত্যতীর্থ চতুর্বিংশ বার্ষিকী সংখ্যাটি কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যার রচনাগুলির সঙ্গে আরো কিছু যুক্ত হয়ে স্মরণিকার এই আত্মপ্রকাশ সম্ভব হল।

সাধ আর সাধ্যকে সামঞ্জস্য করে সাধ্যমত পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যতীর্থের প্রথম তীর্থপতি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধা নিবেদিত হচ্ছে। আজকের এই শতবর্ষের প্রণাম নিবেদনের সৌভাগ্যকে একান্ত গর্বের ও গৌরবের বলেই মনে হচ্ছে—কারণ কবিমনীষার নীরব সাধককে প্রণতি জ্ঞাপনের সুযোগ হয়েছে।

সপ্তশিষ্য-বেষ্টিত রবীন্দ্রনাথ

উপবিষ্ট করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
দণ্ডায়মান চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
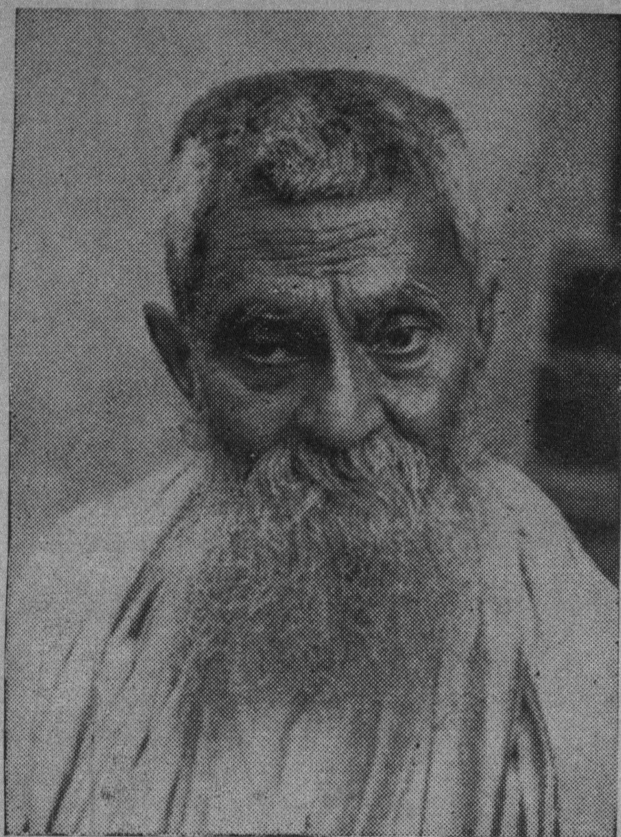
কবি করুণানিধান
বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
হাওড়ায় মধুসূদন
বিশ্বাস লেনের
অবস্থানগৃহ

কবি করুণানিধানের স্মৃতিচারণ

বনফুল

বাংলা দেশে কবি হয়ে জন্মগ্রহণ করা এক পরম দুর্ভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথ যদি নোবেল পুরস্কার না পেতেন? ভাগ্যিস পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বড় কবি। তাঁর প্রতিভার দিকনির্ণয় করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের বাংলাসাহিত্যে আর যে অনেক বড় কবি জন্মেছেন আমরা কিন্তু তাঁদের কজনকে আর মনে রেখেছি! অক্ষয়কুমার বড়াল আজ বিস্মৃত। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও আমরা কজন আর জানি! অনেকেই ভুলে গেছেন।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-পরবর্তী যে কয়জন কবি ছিলেন যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, কালিদাস রায়—এঁদের মধ্যে সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন একজন।

অনেক বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার সামনাসামনি পরিচয় ও আলাপ হয়েছে। এটা আমার সৌভাগ্য।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সৌভাগ্য একবার সামনাসামনি দেখা হয়েছিল। তাঁকে আমি প্রথম দেখেছিলুম কোথাও গিয়ে নয়, তিনি হঠাৎ—হ্যাঁ হঠাৎই তিনি আমার ভাগলপুরের বাড়িতে এসেছিলেন একদিন কোনো খবর না দিয়ে। তিনি যাচ্ছিলেন মধুপুর; তিনি ভাগলপুর স্টেশনে পুর শব্দ দেখেই ভাবলেন মধুপুর।

কবি করুণানিধানের আমার ভাগলপুরের বাড়িতে যাওয়াটা সত্যিই আকস্মিক। অন্যান্য সাহিত্যিকরা প্রায় কোনো-না-কোনো সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ভাগলপুরে গিয়েছেন এবং আমার বাড়িতে সেই সময় আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু করুণানিধান তা করেন নি। তিনি হঠাৎ গিয়েছিলেন।

একদিন সন্ধের সময় বাড়িতে বসে আছি। দেখি একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। একটা ছেলে গাড়ি থেকে নেমে এসে বললে—কবি করুণানিধান এসেছেন।

কবি করুণানিধান! অবাক হয়ে ছেলেটিকে প্রশ্ন করলুম। আমি প্রথমে বুঝতেই পারি নি। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় তিনি?

সে বললে—গাড়িতে।

আর বললে—হ্যাঁ তিনি ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন মধুপুর। ট্রেনটা অনেক ক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটাই মধুপুর স্টেশন? ছেলেটা বলেছিল—ভাগলপুর। শুনে তিনি বললেন—এটা ভাগলপুর! তা হলে তো এখানে বনফুল থাকে। এখানেই নামবো। বনফুল যেখানে আছে সেইখানেই মধুপুর।

যাই হোক তার পর তিনি সেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে জিনিসপত্তরসহ একটা ঘোড়ার গাড়ি করে এলেন আমার ভাগলপুরের বাড়িতে। তিনি গাড়িতে বসে আছেন শুনে আমি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলুম। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার দুগালে—এগালে ওগালে কপালে, ঠিক ছোট ছেলেকে যেমন ভাবে চুমু খায় ঠিক তেমনি ভাবে চুমু খেলেন।

আমি বললুম—আপনি হঠাৎ এলেন?

বললেন—অনেকদিন থেকে ভাই তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। ভাবলুম ভাগলপুর স্টেশনে ট্রেন এসেছে যখন তোমাকে দেখেই যাই। এ সুযোগ আর ছাড়লুম না। ভারী খুশি হলুম তোমাকে দেখে। তুমি আমার জন্যে কিছু মাত্র ব্যস্ত হয়ো না। আমার রাত্রিতে খাবার লাগবে না, কিছু লাগবে না। আমার সঙ্গে বিছানা-টিছানা আছে। তোমার লেখা পড়ে আমার এত ভালো লেগেছে যে তোমায় দেখার আমার বড় আগ্রহ ছিল। ট্রেনটা ভাগলপুরে থামায়, আমি বললুম এ সুযোগ আমি ছাড়বো না। আমি নেমে পড়লুম।

আমি বললুম—আপনি আমার অগ্রবর্তী, আমার জ্যেষ্ঠ। আপনি আমায় এত পরপর ভাবছেন কেন? কিচ্ছু খাবেন না, সেকি হয়? রাত্রে ভাত বা রুটি, দুধভাত বা সাবু যা বলবেন তাই হবে।

অনেক পেড়াপিড়িতে বললেন—আমার জন্যে বিশেষ কিচ্ছু ব্যস্ত হতে হবে না, আমি একটু দুধ আর খৈ খাবো। কই, বৌমাকে ডাকো আমি বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি।

বৌমা এলেন। বললেন—আমার জন্যে কিচ্ছুমাত্র ব্যস্ত হতে হবে না বৌমা। আমি সামান্য দুধ-খৈ খাই। আমার সঙ্গেই বিছানা মশারী সবই রয়েছে। আমি এই বারান্দায় একধারে রাত কাটিয়ে দেবো।

আমি বললুম—না-না, আপনি বারান্দায় শোবেন কেন? ঘরের মধ্যে খাট রয়েছে খাটের ওপর শুয়ে থাকবেন। বারান্দায় কেন?

অনেক গল্প, আর কবিতা নিয়ে সে তো কত কথা, কত গল্প। আমার মনে হল যেন একটা সুদূর কোনো পর্বতের একটা ঝর্ণা যেন একেবারে আমার ছোটো বাড়িতে এসে হাজির হল—ঝর-ঝর, ঝর-ঝর করে ঝরছে। তিনি অনর্গল কথা বলছেন, কবিতা বলছেন। কখনো হাসছেন কখনো কাঁদছেন।

তার পর রাত্রিতে তাঁকে খাইয়ে-দাইয়ে শোয়ালুম।

সকালে উঠেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি, তিনি ঘরে নেই। এত সকালে কোথায় গেলেন? এ ঘর ও ঘর দেখি, না, কোনো ঘরেই নেই। বুড়ো মানুষ, একা কোথায় গেলেন? তখন রাস্তায় বেরিয়ে এলুম। চারদিকে দেখছি। আর একটুখানি এগিয়েই চললুম। বেশ খানিকটা গিয়ে একটা চৌরাস্তা থেকে খুব সরু গলি বেরিয়েছে। সেই গলিতে মিউনিসিপ্যালিটির একটা প্রকাণ্ড নালি আছে। দেখি কবি করুণানিধান সেখানে মাটিতে উঁচু হয়ে বসে থেলো হুকোয় তামাক খাচ্ছেন আর কেশে কেশে কফ-গয়ের ফেলছেন।

আমি বললুম—সে কি, আপনি এখানে চলে এলেন কেন?

—তোমার বাড়িটা খারাপ করবো না, তাই।

আমি বললুম—না, খারাপ করবার কি আছে? বাড়িতে লোকজন রয়েছে, তারাই সাফ করে দিতো, আপনি এখানে এলেন কেন?

বললেন—তোমার বাড়িটা কেন ময়লা করবো? আমার সকাল বেলা এটা বেরিয়ে না গেলে অস্বস্তি কাটে না।

তখনও তিনি হাঁপাচ্ছেন। আমি একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এলুম। আমি বললুম—না না, আপনি চলুন।

আমি তখন সঙ্গে করে আবার বাড়িতে নিয়ে এলুম। আমি বললুম—আপনি থাকুন এখানে, আপনি এত সংকোচ করছেন কেন?

তিনি বললেন—সংকোচ কিছু নয়। আমি ভাবছি কি জানো? তুমি আমার সুন্দর দিকটা শুধু দেখেছো তোমাকে খারাপ দিকটা দেখাতে চাই না। আমার কবিতা পড়েছো, আমার ভালো দিকটা দেখেছো, নোংরা দিকটা কাউকে দেখাতে চাই না।

বাড়িতে এসে বললেন—বৌমাকে ডাকো। বেশি কিছু যেন খাওয়ার

আয়োজন না করেন। আমি বেশি কিছু খেতে পারি না। শরীরে সব কিছু সয় না। তাই বলে, তিনি কি কি খেতে পারেন সব কিছু একে একে বলে-গেলেন শুকতো-টুকতো ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুদিন ছিলেন আমার বাড়িতে। কত গল্প করলেন। আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলুম তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। যাবার সময় দুহাত দিয়ে আমার মাথায় আশীর্বাদ করে গেলেন।

হ্যাঁ, আর একবার দেখা হয়েছিল কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেবার রেডিয়োর কবি সম্মেলনে ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ অনেকেই। তবে সে এক ভয়াবহ কবি সম্মেলন। করুণানিধান এক দীর্ঘ কবিতা লিখে নিয়ে এসেছিলেন। আমায় দেখাতে, আমি বললুম—এতে যে অনেক সময় লাগবে। আপনি প্রথম অংশটা পড়লেই বোধ হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিক হবে। তিনি তো পড়তে লাগলেন। কিছুটা পড়ার পরই তাঁর শরীর খারাপ করতে থাকায় তখন সজনী-প্রেমেন তাঁকে নিয়ে পাশের একদিকে শোবার ব্যবস্থা করলে। তিনি তো প্রায় শয্যা নিলেন। কবি সম্মেলনে কবিতাপাঠ সকলের চলতে লাগলো। সেই শেষ দেখা আমার সঙ্গে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং কবি জীবনানন্দ দাশেরও। কারণ তার পরই ট্রামের ধাক্কায় চোট খেয়ে মারা গিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। সেইদিনই জীবনানন্দকে প্রথম ও শেষ দেখি। সজনী এমন কাশতে আরম্ভ করলে যে সে আর থামে না। আমার গলাও সেদিন ভাঙা ছিল। তাই ভয়াবহ কবি সম্মেলন বলেছি।

সেই মানুষটি এত সরল এবং শিশুর মতো ছিলেন যে সে রকম লোক আর দেখতে পাই না।

তাঁর ছবিতে দাড়িটাড়িগুলো বেশ বাগিয়ে আচড়ানো কিন্তু তা এলোমেলো উড়ো উড়ো থাকতো।

সেই মহাকবিকে স্মরণ করে প্রণাম জানাচ্ছি, এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য কারণ মহৎলোককে প্রণাম করবার সৌভাগ্য বা প্রণাম করবার বুদ্ধি অনেকেরই হয় না। মহৎলোক তার জন্যে গ্রাহ্যই করেন না—কে তাঁকে প্রণাম করলো বা না করলো। কিন্তু যে প্রণাম করে সেই মহত্ব লাভ করে।

কবি করুণানিধান শ্রদ্ধাঞ্জলি

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ছায়ায় পরিবর্ধিত কবিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির কবিও বটে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায় সকলেই বয়সে তাঁর থেকে ছোট ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বেশ অল্প বয়সেই চলে যান। অন্য দুজন তাঁর থেকেও দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। করুণানিধানের কবিতা ছন্দ ও ভাষায় বেশ সমৃদ্ধ ছিল, ভাবও ছিল উচ্চস্তরের। তিনি পাঠক সমাজে স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানকালে তাঁর কবিতা আর কেউ বিশেষ পড়েন না। তিনি এক রকম বিস্মৃত প্রায় কবি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তার কারণ বোধ হয় পাঠকের রুচির পরিবর্তন। ছন্দের প্রতি কবির আকর্ষণ এখন শিথিল হয়ে গিয়েছে, ভাবে এখন হৃদয়বৃত্তির স্পর্শ বিশেষ নহে, তার মননশীলতার দিকে বেশি ঝোঁক।

সে যাই হোক, বর্তমান বছরে কবি করুণানিধানের জন্মতারিখ শতবর্ষ অতিক্রম করবে। সুতরাং তাঁকে স্মরণ করে তাঁর কবিতার আলোচনার একটি উপলক্ষ্য এসেছে। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এই উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের আয়োজন করে তাঁদের একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সম্পাদন করছেন। বর্তমান প্রবন্ধে কবি করুণানিধানের কবিপ্রতিভার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করছি।

কবি করুণানিধানের রচিত কবিতায় বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি খুব বেশি নয়। তাতে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা আছে, কিছু প্রেমময় কবিতা আছে এবং শেষ জীবনে রচিত কিছু ভক্তিমূলক কবিতা আছে। মনে হয় এই তিনটিই তাঁর কবিতার মূল সুর। প্রথম জীবনে কবি প্রকৃতিকে ভালোবেসেছিলেন। তরুণ বয়সে তার প্রতি যে প্রীতির সঞ্চার হয়েছিল তা পরবর্তী জীবনে শিথিল হয়ে গেলেও একেবারে শুষ্ক হয়ে যায় নি। প্রিয়াকে তিনি ভালোবেসেছিলেন গভীরভাবে। তাই দেখি সাতাশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহনের পর তাঁকে হারিয়ে কবি গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন। তার প্রেরণায় যে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। প্রৌঢ় বয়সে সংসারের শোক-তাপ তাঁর মনকে ঈশ্বরের অভিমুখে আকর্ষণ করেছিল। এই বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে একটি সুন্দর আত্মনিবেদনের মনোভাব ফুটে উঠেছে। অতিরিক্ত ভাবে তাঁর রচিত কিছু বিশিষ্ট মানুষের প্রশস্তিমূলক কবিতা আছে। ভাষায় ও ছন্দে তারা সমৃদ্ধ হলেও মনকে স্পর্শ করে না। নিতান্তই গতানুগতিক। অতিরিক্ত ভাবে নানাধর্মী কবিতাও তিনি কিছু

লিখেছেন। মনে হয় তারা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এইবার এই বিভিন্নশ্রেণীর কবিতাগুলির কিছু পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি।

প্রথমে প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার কথা ধরা যাক। সেগুলি পড়ে বোঝা যায় প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁকে কতখানি মুগ্ধ করত। তার মনোহরণ রূপ তিনি যেন নয়ন দিয়ে পান করে স্মৃতির পটে এঁকে রাখতেন। তাই তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় একটি নূতন আস্বাদ পাওয়া যায়। তা ত বর্ণনা নয়, তা বাক্যের সাহায্যে ছবি আঁকা। তা পড়লে মনে হয় বর্ণনা শুনছি না, শিল্পীর আঁকা ছবি চোখের সামনে দেখছি। কিছু উদাহরণ স্থাপন করা যাক।

একটি কবিতায় সন্ধ্যার আকাশের বর্ণনা কবি এইভাবে করেছেন—

আকাশের শেষে অবনীর শেষ ;
মেঘের ওপারে শ্রান্ত দিনেশ,
এলাইয়া পড়ে সন্ধ্যার কেশ দখিনায় দুলে দুলে।

(দিনান্ত মেঘে

দৃশ্যটি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সূর্যের তেজ যেমন দিনান্তে স্তিমিত হয়ে আসছে, তেমন সন্ধ্যার কেশ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

কবির দেশভ্রমণে বিশেষ আকর্ষণ ছিল মনে হয়। ভারতের নানাতীর্থ এবং মনোরম দর্শনীয় স্থানগুলিকে তিনি দেখে এসেছিলেন, তার পরিচয় তাঁর কবিতাগুলি হতে পাওয়া যায়। ওয়ালটেয়ারে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার বেলাভূমির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তার রূপটি তিনি কেমন দেখেছিলেন তার কিছু পরিচয় নীচের কাব্যাংশে পাওয়া যাবে —

সামনে হেরি সুনীল বারি তালীবনের ফাঁকে,
গেরুয়া রঙ্ ভাঙা মাটি ঢালু পথের বাঁকে ;
ঝর্ণা-ঝালর পড়ছে ঝরি
শ্যামল তরু-পর্ণ পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে কালো পাথর ঢাকে।

(ওয়ালটেয়ার

শুধু এই বর্ণনা পড়েই যে কোনো দক্ষশিল্পী ওয়ালটেয়ারের বেলাভূমির রূপটি তুলিতে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন মনে হয়।

এবার প্রেমের কবিতার কথা উত্থাপন করা যাক। কবি কি দৃষ্টিতে যে প্রেয়সীকে দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পরস্পরের প্রীতি কত গভীর ছিল, তার পরিচয় পাই প্রেয়সীর মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি অন্তরকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে। তাইত হয়ে থাকে। মনে হয় প্রেমের গভীরতম, সুন্দরতম রূপটি ফুটে ওঠে বিচ্ছেদের মধ্যে। তাই বিরহের কবিতা এত সুন্দর। তাই কালিদাস রচিত ‘মেঘদূত’ কাব্য মনকে

এমন স্পর্শ করে। তাই মরণান্তর বিচ্ছেদের কবিতা এত মর্মস্পর্শী। তাই কালিদাসের অশ্রুবিলাপ বা রতিবিলাপ এমন মর্মান্তিক। তাই কবি অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত 'এষা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। সেই কারণেই দেখি কবি করুণানিধানের এই শ্রেণীর কবিতা-গুলির মধ্যে তাঁর কবিত্ব শক্তি তার পরিপূর্ণ শোভায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

সাতাশ বছর যিনি কবির সাথীরূপে কবির জন্য স্নেহের নীড় রচনা করেছিলেন, তিনি চলে গেলে মনে বেদনা জাগানো স্মৃতি ছাড়া কবির জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাই কবি বলছেন—

পিছু পানে ফিরে চাই সে স্নেহের নীড় নাই
সে পুণ্য কুটীর।

যে স্মৃতি কবিকে সব থেকে পীড়া দেয় তা হল যেদিন প্রেয়সীকে চিতার শেষ শয্যায় শুইয়ে দিয়ে এলেন তার স্মৃতি—

এমনিতরই চাঁদনী রাতে বালির বালিশ শয্যা 'পরি
শুইয়ে দিলেম শেষ-প্রতিমা অশ্রুনদীর কিনার ভরি।
এই হৃদয়ের আধেকখানি পুড়ল ধূ ধূ চিতার বুকে,
আধখানিতে দারুণ ব্যথা শোণিত ছোটে ক্ষতের মুখে। (হারা

প্রৌঢ় বয়সে কবির কাব্য পরিণতি লাভ করেছিল ভক্তিমূলক কবিতায়। সংসার জীবনের দুঃখ, শোক, তাপ, লোভী মানুষের ঘৃণ্য অর্থলিপ্সা তাঁর মনে বিতৃষ্ণা সঞ্চার করে, এর জন্য পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। তিনি যে সেই কারণেই ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় নীচের কাব্যাংশে—

রূপ ও রূপার লালসার বিষে বিপন্ন জনে রক্ষা কর।
এই বিপণির পরিচয় থেকে এই দরিদ্র অধমে তর। (পুরীতে

কবির ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সুন্দর চিন্তাকণা এই কাব্যাংশটিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ভাবে তাঁকে পাবার ব্যাকুলতাও তাতে পরিস্ফুট হয়েছে—

কুসুম-হারে সূতার সম লুকিয়ে আছ অপ্রমাণ,
পাপড়ি কবে পড়বে খসে? চিনব তোমায় জগৎপ্রাণ। (চিরসুন্দর

মনে হয় কবি একদিন তাঁর ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের মনোভাব নিয়ে ডাকলে এই অনুভূতি না জেগে পারে না। ফলে তিনি গভীর শান্তি অনুভব করেছিলেন। এই আত্মনিবেদনের ফলশ্রুতি কবির মনে কি গভীর তৃপ্তির অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছিল তার পরিচয় নীচের কাব্যাংশে পাই—

ধর্ম তুমি, শর্ম তুমি, নিখিল তব নর্ম নাথ,
আজ তোমারে ডাকছি প্রভু, আজ কি আমার সুপ্রভাত !
মন্থে না আর অন্তঃসাগর হিংসাদ্বেষের মন্দরে,
উথলে ওঠে শান্তি সুধা গভীর নীরব-কন্দরে।
মনের মাঝে নূপুর বাজে, জীবন-মরণ গুঞ্জরি
ঝরে তোমার চরণতলে প্রেম-পারিজাত-মঞ্জরী। (শান্তি

তার পর আসে প্রশস্তিমূলক রচনা। আগেই বলা হয়েছে এই শ্রেণীর কবিতাগুলি মনকে তেমন স্পর্শ করে না। ভাষায় ও ছন্দে সমৃদ্ধ হলেও এ কবিতাগুলি নিতান্তই গতানুগতিক। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি হতে দুটি পংক্তি স্থাপিত হল—

জয়ন্তী প্রতিভাচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া, বিশ্ব চমকিয়া,
ভো রবীন্দ্র বাগীশ্বর, বাণী তব অবিস্মরণীয়া।
...
যশের দুন্দুভি-তূর্যে দিঙ-মণ্ডলে আরতি তোমার,
নমস্তে বিরাট কণ্ঠ, চিরঞ্জীব কবি অবতার। (রবীন্দ্র-আরতি

এইবার গাথাশ্রেণীর কবিতার কিছু পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনটি কাহিনী কবিতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—'জয়দেব' 'চণ্ডীদাস' ও 'বাদশাজাদী'। প্রথমটিতে জয়দেব ও পদ্মাবতীর কাহিনী আছে। দ্বিতীয়টিতে আছে চণ্ডীদাস ও রামীর কাহিনী। তৃতীয়টিতে পাই সম্রাট আওরঙজেবের কন্যা জেবুন্নেসার সহিত ওকিল খাঁর প্রণয়ের মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনী। তিনটি কবিতাই মনোরম হয়েছে। কাহিনীর কথনভঙ্গি, নাটকীয়ত্ব এবং ভাষার কারুকার্য তাদের রীতিমত রসোত্তীর্ণ করেছে। একাধারে ভাষা ও ছন্দোমাধুর্য ও নাটকীয়ত্বের উদাহরণ হিসাবে 'চণ্ডীদাস' কবিতার শেষের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রামীর ঐকান্তিক প্রেমনিষ্ঠা যখন চণ্ডীদাসকে চিতাশয্যা হতে জীবিত করে তুলল, তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে এই বলে বৃন্দাবনের পথে চললেন—

সাজ আজিকে সংসার-খেলা, এসো বরাননি ধনি !
হেরিব কৃষ্ণ, জীবন-কৃষ্ণ, রাধার হৃদয়-মণি।
কেলিকদম্ব-কুঞ্জছায়ায় ধায় কালিন্দী বাঁকা,
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পমালিকা নবীনাম্বুদে ঢাকা—
কোথা মুকুন্দ দোল-গোবিন্দ ভুবন-বন্দনীয় ?
এসো অনিন্দ্য, নয়নানন্দ, হে পরম রমণীয়। (চণ্ডীদাস

কবি কালিদাস রায় করুণানিধানের নির্বাচিত কবিতার সংকলনগ্রন্থ

'শতনরী'র ভূমিকায় লিখেছেন করুণানিধানের কাব্যের মূলসুর হল স্বপ্নাবেশ। তিনি লিখেছেন—'আমরা বলি, তিনি সমগ্র সৃষ্টিকেই দেখিয়াছেন স্বপ্নজালের চিকের মধ্য দিয়া। তাঁর স্বপ্নলোকে দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, পাপ নাই, মালিন্য নাই, জৈব জীবনের কোনো চাহিদার কথা নাই, জরা-মরণ নাই।' কিন্তু তাঁর কবিতা পড়ে মনে হয় না, তিনি এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। উপরের আলোচনা হতে দেখা যাবে, তিনি সংসারে আঘাত পেয়েছেন, প্রিয়জনের মৃত্যুতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করেছেন, সংসারে নানা অনাচার দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন এবং শেষে শান্তিলাভের জন্য তিনি ঈশ্বরের শরণ নিয়েছেন। এখানে স্বপ্নবিলাসের প্রমাণ ত কিছু পেলাম না। তবে এ কথা সত্য তিনি একটি মহাপ্রাণ মানুষ ছিলেন, বৈষয়িক সম্পদের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। আধ্যাত্মিক সম্পদই তাঁর কাছে বেশি মূল্যবান ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি, প্রীতির কবি, প্রেমের কবি এবং সর্বোপরি ঐকান্তিকভাবে ভক্ত কবি।

তবে তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষাই যে ছিল না, তা নয়। একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সাধনাতে সিদ্ধি চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি অন্তরের তাগিদেই কবি হয়েছিলেন। তিনি বাগ্‌দেবীর কাছে চেয়েছিলেন 'ললিত ভাষে বাণীর মানিক গাঁথতে'। এই প্রসঙ্গে নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশটি লক্ষ্য করা যেতে পারে—

> তোমারি বিশ্ব-বিনোদ-বীণার দিব্য তানে
> তন্ময় হয়ে রহিব, সারদে, তোমারি ধ্যানে
> স্বচ্ছ বিশদ, উজ্জ্বল ভাষা দাও মা দাসে,
> গাঁথিব পুণ্য বাণীর মানিক ললিত-ভাষে। (বন্দনা

মনে হয় বাগ্‌দেবী তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। তিনি ললিত ভাষায় বাণীর মানিক গেঁথে বিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের প্রথম সারিতে একটি সম্মানের আসন অধিকার করে নিয়েছিলেন।

শতনরী

বাণী রায়

প্রথমেই বইখানির ভূমিকাকার ও সম্পাদক, কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভূমিকার প্রথম কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাক—'কবি করুণানিধান বাংলার জীবিত কবিগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। ইঁহার বয়ঃক্রম সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ইনি এখন সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন।' তার পরেই দেখা গেল করুণানিধানের বন্দনায় কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের উক্তি—'নিত্য-জ্যোৎস্না বসন্তের রাতি যেথা কভু না পোহায়'—করুণানিধানের কাব্যলোকের বর্ণনা।

করুণানিধানকে ১৩৫৬ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ' সপ্তয়বর্ষ-প্রবেশে সম্বর্ধনা করেন। ১৯৪৫ সালে বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যিকদিগের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনায় 'শতনরী'-গ্রন্থপ্রকাশের আয়োজন করিয়াছিলেন 'মিত্র ও ঘোষ'এর কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে করুণানিধানকে সাহিত্যবিষয়ে জগত্তারিনী-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। এমনি বিভিন্ন সম্বর্ধনা-সভায় আমাদিগকে কেউ আহ্বান করে নাই। কবি করুণানিধানকে চাক্ষুষ দেখিবার সৌভাগ্যও হয় অনেক পরে। রেডিওর কবি সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে একত্র কবিতাপাঠের সৌভাগ্য হয়। তবু, আজ তাঁহার কাব্যবিচারের ভার পড়িয়াছে আমারি উপরে। একটি চিরন্তন সত্য এ ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

স্রষ্টার মূল্যনির্ণয় প্রকৃত পক্ষে পরবর্তী কালের দায়িত্ব। কারণ, যে কবি সৃষ্টিকার্য শেষ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অবসিত কবি। তাঁহার পরিবেশে, সমপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সমালোচক অপেক্ষা যথার্থ সমালোচনার ক্ষেত্র পরবর্তী যুগের সমালোচকের পক্ষে যোগ্যতর। আমরা হাত পাতিয়া পূর্বসুরীদের প্রতিভা গ্রহণ করিয়াছি, ছাপা পৃষ্ঠায় তাঁহার জগতকে পাইয়াছি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরই সম্ভবপর।

বাংলাদেশের সাহিত্যিকবৃন্দের বৈশিষ্ট্য পরস্পরের প্রতি অকারণ অসূয়া। বিপ্লবী বাংলার সমগ্র বিপ্লববহ্নি মুক্তি পাইয়াছে কলমের কলহে। সেই দেশে আমার জ্ঞাতসারে করুণানিধানের শত্রু কেহ ছিল না। কেন?

হয়তো, তিনি 'আত্মপ্রচারের কোনো আয়োজন করেন নাই' (ভূমিকা), অথবা তাঁহাকে লইয়া কেহ মাতামাতি করে নাই, অথবা তিনি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে বহুদিন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা তিনি স্বভাব মাধুর্যে সকলের মন জয় করিয়াছিলেন। জানি না, ইহার মধ্যে কোনটি সত্য।

করুণানিধানের কাব্যলোক সম্পর্কে পূর্বেই আমরা মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের বর্ণনা পাইয়াছি। ভূমিকাকার মহাশয়ও বলিয়াছেন করুণানিধানের

রচনায় sequence স্বপ্নাবেশের sequence ইহারা দুইজনে কবি, তৃতীয় কবি সম্বন্ধে ইহাদের বিশ্লেষণ প্রধানত স্বপ্ন ও জ্যোৎস্না।

তাহা হইলে করুণানিধানের কাব্যসঞ্চয়ের প্রাণস্পন্দন কোথায় ধরা যায়—ধরা যায় আমাদের জগতের সহিত তাঁহার জগতের পার্থক্য। সত্তর বৎসরের পুরুষ প্রেমিক হিসাবে পাংক্তেয় না হইলেও প্রতিভা হিসাবে মৃত হইতে পারেন না। গ্যেটে সত্তর বৎসর বয়সে তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়া অশীতিবর্ষের পরে 'ফাউষ্টের' দ্বিতীয় খণ্ড লিখিয়াছেন। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও কাব্য রচনা করিয়াগিয়াছেন। করুণানিধান দীর্ঘদিন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ খুঁজিলে সন্ধানী মন পাইবে কবির আত্মকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ কবির মনের কাব্যলোক। এই আত্মকেন্দ্রিকতা তাই কেবল আত্মকে লইয়া নয় সম্পূর্ণ স্বয়ংসৃষ্ট একটি জগতকে লইয়া, যে জগৎ স্বপ্নলোক ও প্রেমলোক।

জগতকে হয় তো অনেক সময় উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু মানুষকে চলে না। কবির মানুষও ভিন্ন জাগতিক। মনে হয়, আমাদের কবির প্রিয়া বর্তমানের নারী অপেক্ষা কত ভিন্ন! কবির প্রিয়ার অঙ্গে এলায়িত নীলাম্বরী, টেকা খোঁপা, চুলে জড়ানো কানের দুল, লজ্জানত দৃষ্টি, চাবির রিঙ—সব কিছুই বর্তমানের প্রিয়ার কাছে অপরিচিত। কাল-আবর্তনে সর্বাপেক্ষা পরিবর্তন ঘটিয়াছে বাংলার নারীর। যে কবি বর্তমানের নারীকে ভালোমন্দ বিচার না করিয়া ভালোবাসিতে পারিবেন না, সে কবি বর্তমানকে ভালোবাসিবেন না। বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রধান চিহ্ন এই। রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা এই সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। 'চোখের বালি'র আশার বিবর্তন, 'চার-অধ্যায়'এর এলালতাতে ও 'ল্যাবরেটরি'র নীলাতে।

কবি করুণানিধানের মধ্যে প্রধান যে ভাবটি আমরা পাই, তাহা এক কথায় অতীতের প্রতি তীব্র অনুরাগ। বেদনা কবিচিত্তের ধর্ম। প্রিয়জন বিরহই সে বেদনার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সময়ের দ্রুতগতিও সে বেদনার পৃষ্ঠপোষক। কবির যৌবনকালের কবিতাও একটা বিদায়ের ব্যথা আশ্রয় করিতে চায়। তাই তিনি যাহা কিছু হারাইয়াছেন তাহার জন্যই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা তাঁহার কবিমনের ধর্ম। বর্তমানের সঙ্গে তাঁহার বোধ হয় কখনই আপোষ ছিল না। ইতস্ততঃ কবিতা চয়নে দেখা যাক—

'সে-লিপি হয়েছে হারা অনুদিন বাঁকা-লেখা তার…
উন্মাদ-অধিক-মন স্বপ্ন দেখে জাগে বারবার?' (শেষলিপি

'ভিতর পানে ফিরিয়া চাই, আজকে কেন সে মন নাই।' (পঞ্চাশ বছর পরে

'দেয় স্মৃতি বড় দাগা'— (প্রবাসী

'আর কি তেমন করে জোড়া লাগে মন?
জাগে কি পুরানো সেই দিনের স্বপন?' (অ-দর্শনে

'বাহিরের মেলা ভাঙিয়াছে।' (শেষ

'আজকে পিছে চাই গো মিছে নেই সেদিন'—(তোমার প্রতি

বিশেষ বক্তব্য এই যে এই কবিতাগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪-২২৮ ইহারা পাশাপাশি আছে—এইরূপ কবিতার সমাবেশ বইখানির সর্বত্র। যে কোনো স্থানে ধরিয়া খুলিলে অনুরূপ ভাবের পরিপোষক পংক্তির অভাব ঘটিবে না। বেদনাতুর কবির মন দুর্বল—দুর্বল কোমলতা তাঁহার কবিতার উপজীব্য। তাহারা একটি রূপ ও রসের অনির্বচনীয় জগৎ আঁকিয়া যায়—

'রূপের তরী ভাসায় পরী গৌরী চাঁপার রঙ মেখে,
পদ্ম-গোলাপ নিন্দি পাখা পরিয়েছে তার অঙ্গে কে!' (তন্দ্রাপথে

এইবারে কবির কবিতায় দ্বিতীয় ও প্রধান উপজীব্য পাই যাহার কথা পূর্বেই কবিশেখর লিখিয়াছেন—স্বপ্নের Sequence। কবির স্বপ্নাবেশ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহারা abstract নয়, Concrete formএ আসিয়াছে। কাজেই, সত্য যদি করুণানিধানের Sequenceএর কোনো ইংরাজি নাম আবশ্যক হয়, আমার মতে আমারা বলিতে পারি Pictorial Sequence। সমস্ত কবিতাগুলি তার আশ্রয় করিয়াছে চিত্রে। কবির চিত্রধর্মী মন সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকিয়া মনোভাবকে প্রকাশ করিতেছেন।

'একলাটি সে থাকত শুয়ে, সাঁঝের আলোর ঝলমলে,
ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু দুর্বাদলের মখমলে—
এলিয়ে দিত ফুলের বাজু উজল ভুজ-বল্লরী
কাঁটাহারা তরুণ গোলাপ-শাখার মতন টল্‌মলে!' (মনোহারিকা

অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যক হইবে না। কাব্যগ্রন্থখানির সর্বত্র এই চিত্রের প্রাদুর্ভাব। ধ্বনিযোজনা ও ছন্দের অনন্যসাধারণ দক্ষতায় কবি চিত্র লিখিয়াছেন। চিত্রধর্মীমন অতীতের অনুরাগে কয়েকটি কথিকার সার্থক সৃষ্টি করিয়াছেন—'জয়দেব' 'চণ্ডীদাস' 'বাদশাজাদী' ইত্যাদি। আধুনিক যুগের গাথা 'মৃণু'। অতীত অবলম্বন করিতে পারেন নাই কবি।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় কবির মন সম্পূর্ণ প্রাচ্যভাবাবলম্বী। তাই 'অরফিউস ও ইউরিডিস' কবিতাটির পটভূমিকা কবির হাতে প্রাণহীন। যে সকল শব্দের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা প্রাচীন গ্রীক পুরাণকে অঙ্কিত করিতে সহায়তা করিতে পারে, তাহা কবির হাতে ধরা দেয় নাই, যথা—

গাহে—'ত্বরা করে নিয়ে চলো মোরে পাকড়ি ধরিব চরণ তাঁর,
মেবেন সদয় মঙ্গলময়, গলাইব তাঁর অশ্রুধার।'

অত্যন্ত নির্জীব ও হাস্যকর। অথচ 'বাদশাজাদী' কবিতায় অপূর্ব কাব্য সম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে—'কমলাফুলি ঘোমটা খুলি এগিয়ে দিয়ে চুল,
একলা ঘরে বাদশাজাদী ছিঁড়ছে ছিল 'গুল'।

আচম্‌কা সে ফিরিয়ে গ্রীবা ঝর্কা পানে চায়,
সুর্‌কি-রাঙা রাস্তা থেকে দেখ্‌লে যুবা তায়।'

শুধু শব্দচয়নেই এই মোগল আবহাওয়া ফোটে নাই। পূর্বের কবিতাটিতে 'ব্যাঞ্জো', 'অলিম্পাস' প্রভৃতি শব্দও আবহাওয়া রচনা করে নাই, পল্লী সীমন্তিনীর অধরে লিপষ্টিকের মতো তাহারা বেমানান। অথচ কবির মন সহজ গ্রাম্যতা লইয়া সুখী নয়—মুসলিমকৃষ্টির কাছে ঋণস্বীকার সর্বত্র।

'কই সে চাওয়া সাধ মেটানো! খুশরোজে কি খেয়াল শেষ?
পরদেশীয়া দর্‌দিয়া কে ভাঙিয়ে দিলে তন্দ্রারেশ।' (ফিরে চাওয়া
'মোতির ঝালর দুলিয়েছে সে গরীবখানায় মোর,
কে জানিত তার বিহনে গল্‌বে আঁখির লোর!' (মাল্যবতী

কবির কলমে অন্তর 'দিল' ও 'কলিজা', পৃথিবী 'দুনিয়া', যবনিকা চিক, স্বপ্নপুরী 'রঙমহল', পথিক 'মুসাফির', পাত্র 'পেয়ালা', মমতা 'দরদ' ইত্যাদি। তিনি 'গোলাপ' ভালোবাসেন, তাঁহার মানসী রেশমী ওড়না পরেন, ফিরোজানীল আকাশের নীচে 'গম্বুজ' মাথা তোলে, 'জাফরানরঙের' আঁচলা ওড়ে, কিরণহুরীর মণির 'মীনার' পদ্মানদীর তীরে দেখা দেয়। বাংলার ঐতিহ্যই তাঁহার ঐতিহ্য হয়। তবে তাঁহার মন প্রাচ্যের Sensuousnessএর মধ্যেই আবদ্ধ। পারসিক সভ্যতার যে লক্ষণ, তাহা অল্পবিস্তর কবির কাব্যে পাওয়া যায়। সেই যুগের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার ইত্যাদি কবির মধ্যে আমরা এইরূপ শব্দচয়ন ও পরিবেশ রচনার চিহ্ন পাই। করুণানিধান তাই অতীতধর্মী মনেও আধুনিকের ছাপ রাখিয়াছেন—assimilationএ। মধুসূদন দত্ত হইতে বাংলা কাব্যে এই প্রচেষ্টা প্রকট।

আমরা কবি করুণানিধানকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আমাদের মতো প্রতীচ্যের দ্বারে না গেলেও চয়ন প্রয়াসী ছিলেন—

'কোন্ সোনালী জেস্‌মিনেরি রেশমী কেশর উল্লসি!' (সে
'নট্‌কোনা রঙ আঁচল ফুটে রূপ দরিয়া পড়ছে ঢলে।' (লুকানো ছবি
'তিক্ত লাগে বিলাসের ইস্তাম্বুল, গুগ্‌গুলের ধূপ।' (শেষলিপি

কখনও কয়েকটি অপরূপ পংক্তি উজ্জ্বল হইয়া ওঠে আধুনিক মনের কাছে 'তিক্ত তার লবণ চুম্বন', 'তরুণ পারুল-কেশর,' 'সঙ্গস্মৃতি বিষদাঁতে', 'আর্শিখানি হারায় পারা, মুখ দেখা কি যায়?' 'মিলন গোলাপগন্ধে বিচ্ছেদের কাঁটার প্রলেপ', 'দোরঙী এ দুনিয়ায়', 'চোখের জলের ঘষা কাচে', 'অজগর রাত্রিরূপ', 'উঠ্‌তি বেলা পড়্‌তি বেলা খেলছে খেলা দুই পাথায়'। চামেলী বেলা, আশমানী গোলাপী রংএ খেলা, নীলাম্বরী ও কাঁচুলি, কানের পিঠের তিল, মুকুল অধর, প্রেমের পেয়ালা ইত্যাদির মাধুর্য স্বপ্নে ভারাক্রান্ত পাঠকচিত্তে বিদ্যুতের মতো উপমার নূতনত্বে ও শব্দবিন্যাসের অভিনবত্বে নূতন আর একটি

জগৎ ফুটিয়া ওঠে। আমরা বর্তমানকালে ওইভাবেই চিন্তা করিয়া থাকি।

করুণানিধানের কাব্য আমার ব্যক্তিগত ভালোলাগা বা না লাগায় কিছু আসে যায় না। আধুনিক সমালোচনায় ব্যক্তিগত পছন্দই বড় কথা নয়। কবির কাব্যের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণই সমালোচনার ধর্ম। তবে কবি করুণানিধানের কবিতা আমার ভালো লাগে। 'শতনরী' আমার প্রিয় গ্রন্থ। যে কাব্যকুঞ্জনের যুগ আমরা দেখি নাই, যে যুগে বাংলা দেশে অনেক কবি ছিলেন, কবিতার অনেক আদর ছিল, সেই যুগ বার বার 'শতনরী'র শত শত পৃষ্ঠা হইতে আত্ম-প্রকাশ করে। মনে হয়, সত্যিই একটি স্বপ্ন ও প্রেমের যুগ ছিল—

'জাগছে মনে দোলের দিনে রঙ্গে চোখে আবীর দেওয়া—
বিজয়াতে জ্যোৎস্নারাতে লুকিয়ে তোমার প্রণাম নেওয়া।
বকুল আজও তেমনি ব্যাকুল, ভিন্ন সে নয় একটি তিল,
শ্যামার শিসে উতল হাওয়া, নীল আকাশ ওই তেম্‌নি নীল।' (নতুন খেয়া

কিন্তু ব্যাকুল সৌরভ, শ্যামার শিস, নীল আকাশ কিছুই সে যুগের বিভ্রমকে ফিরাইয়া আনে না। আমাদের কাছে স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে। অতীতের প্রকৃতি বর্তমানে বিশেষ পৃথক হয় নাই, কিন্তু প্রধান বিবর্তন ঘটিয়াছে মনে। সেই দুরন্ত অস্থির আধুনিক মনে কোনো কবি যদি ক্ষণকালের জন্যও লীলাবিলাস জাগাইতে পারেন, তিনি ধন্য। তাঁর স্বপ্ন ও আমার স্বপ্ন এক নয়। তবুতো আমার জগৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁহারি রূপস্বপ্ন তন্ময় হইয়া যায়—প্রতিক্রিয়াশীল সভ্যতার কৃষ্ণ-যবনিকার অন্তরালে আরক্ত গোলাপ বিকশিত হয়, দক্ষিণাসমীর অকারণে ব্যাকুল করিয়া তোলে। যন্ত্রজর্জরিত কবির বর্ণপ্রলেপে ইন্দ্রধনুর শোভা ধরে। সেই খানেই কবির কৃতিত্ব। সভাস্থলে সহস্রের সম্মুখে পাওয়া গজমোতির হারে কবির জয় লেখা নাই, আছে নির্জনে অনুরাগিনীর গোপন বরমাল্যে। হয়তো এই 'মরমাহত' সাঁঝের পাখি (নিবেদন) কবি সেই জয়-লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। জনতামুখর সভার তার-কাঁটায় গাঁথা পেশাদারী মালা তাঁহার কণ্ঠে কমই শোভা পাইয়াছে সত্য, কিন্তু নির্জনে যে সকল ভক্তহিয়া তাঁহাকে প্রীতির বরমাল্যে সম্বর্ধনা করিয়াছিল, তাহার কি কোনো মূল্য নাই? তাহারা তাঁহারই মতো নীরব। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা তাহাদের নামে অলঙ্কৃত হয় না, সাহিত্যসভায় তাহারা পাণ্ডাগিরি করিতে ছোটে না। সেই সব অখ্যাত অপাংক্তেয় অনুরাগীর দল আছে বলিয়া আজও কবিতা লেখা হয়। তৎকালে করুণানিধানের শুভার্থীবৃন্দ কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়াছিলেন জয়ন্তীসভায় নাগরিকের ঔদাসিন্যে। কিন্তু সত্যই কবির জন্য দুঃখ করিবার তিলমাত্র কারণ নাই। যিনি প্রকৃত কবি, যাঁহার লেখনী রস ও রূপের জগৎ সৃজন করিতে পারে, যিনি আমাদের ভুলাইয়া দিতে পারেন—তিনি সার্থক কবি! সেইখানেই তাঁহার সার্থকতা, তাঁহার যথার্থই মূল্যনির্ণয়।

শতবর্ষের আলোয় কবি করুণানিধান

দেবনারায়ণ গুপ্ত

কবি করুণানিধানের শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। ১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার তিনি জন্মেছিলেন। আর বঙ্গসাহিত্যের কাব্যকুঞ্জ থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন ১৩৬১ সালের ২২শে মাঘ শনিবার। তাঁর মোট জীবিতকাল ৭৭ বছর ৩ মাস ২৩ দিন কৈশোরে পঞ্চকোটে থাকাকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে কাব্যকাননের স্নিগ্ধ ছায়াতলে নিয়ে আসে। তাঁর দশ-এগারো বছর বয়সের রচনা—

সয় না জ্বালা আগুন-খেলা, দাও গো ঢেলে জল।
দাও নিভিয়ে আঁধার করা চিতার ধূমানল॥
সুন্দর এই পৃথিবীতে মানুষ কেন কাঁদে।
ভালোবেসে মধুর হেসে পড়ে মোহন ফাঁদে॥

এই কৈশোরের রচনা থেকে সুদীর্ঘ ৬৩ বছর তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একজন প্রথম সারির কবি হয়েও, সর্বদা পিছনের সারিতে আত্মগোপন করে থাকতেন। গীতার ভাষায় বলতে গেলে, তিনি ছিলেন—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

কবির যখন ৩৪ বছর বয়স অর্থাৎ কবিখ্যাতিতে তিনি যখন সমুজ্জ্বল। তখন আমি এই পৃথিবীর আলোবাতাস স্পর্শ করার সৌভাগ্যলাভ করেছি। আমার যখন ১৬ বছর বয়স, তখন আমি কবিকে সর্বপ্রথম দর্শন করার সৌভাগ্যলাভ করি। কবির বয়স তখন ৫০ বছর। প্রৌঢ়ত্বের কাল থেকে বার্ধক্যের দিকে ঢলে পড়েছেন।

বাংলার আদিকবি ভাষারামায়ণকার কৃত্তিবাসের পুণ্য জন্মভূমি ফুলিয়া তীর্থে আমার সে সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সুদীর্ঘকাল ধরে আদিকবি কৃত্তিবাসের পুণ্য জন্মদিন উৎসব প্রতিপালিত হয়ে আসছে। মাঘ মাসে এই উৎসব হয়ে থাকে। আদিকবি তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জনম লইলা কৃত্তিবাস॥

মাঘ মাসের রবিবার, শ্রীপঞ্চমীতিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীপঞ্চমী যদি রবিবারে না হয়ে অন্যবারে হয়, তা হলে এই উৎসব তার পরের রবিবারে প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

রবিবার ছুটির দিন। কাজেই অনেকের পক্ষেই এই উৎসবে যোগদান করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রদের। আমার তখন স্কুল-জীবন। কাজেই অনেকের সঙ্গে এই উৎসবে যোগদান করার আমারও সৌভাগ্য হ'ত।

রাণাঘাট ও শান্তিপুরের পথে এই ফুলিয়া গ্রাম। এককালে ফুলিয়াকে 'গ্রামরত্ন' বলা হ'ত। একদা ব্রাহ্মণ সমাজের এখানে মেল বন্ধন হয়েছিল। এ ছাড়া এই গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হরিদাস। এখনো হরিদাসের পাট আছে এই গ্রামে। যে সময়ে আমরা ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসবে যেতাম তখন ফুলিয়া ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। বর্তমানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ফুলিয়া গ্রামরত্ন হয়ে না উঠলেও, স্বাধীনতালাভের পর, জনপদ হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসের ভিটায় স্মৃতিস্তম্ভটি আজও সদম্ভে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ হয়ে আছে—একটি কবিতা। নদীয়ার অন্যতম খ্যাতিমান্ কবি (যদিও আজ তাঁর নাম বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে) গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় এই কবিতাটি রচনা করেন। ভাবে ও ভাষায় কবিতাটি অনবদ্য।

হেথা দ্বিজোত্তম
আদিকবি বাংলার,
ভাষারামায়ণকার—
  কৃত্তিবাস লভিলা জনম।
সুরভিত সুকবিত্বে,
ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক! সম্ভ্রমে প্রণম।

সেদিন সম্ভ্রমে প্রণাম জানাতে সকলের সঙ্গে এসেছিলেন কবি করুণানিধান। শ্রদ্ধাবনত শিরে স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে আদিকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন—

আনন্দের গন্ধরাজ নিবেদিয়া পদপ্রান্তে তাঁর
পেলে অমরত্ব বর এইখানে, এই ফুলিয়ার
গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত তোমার সাধন-স্বপ্নবেদী
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ ধ্বজা তার ওড়ে অভ্রভেদি।

কাব্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় কবিকণ্ঠ সেদিন সেই কিশোর অন্তরে যে ছাপ অঙ্কিত করেছিল, আজও তা মুছে যায় নি।

শান্তিপুর সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান। বহু কীর্তিমান কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের জন্মভূমি। বিশেষ করে ১৪০৭ শকে শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন ও সন্ন্যাসগ্রহণের পর অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মাতৃপদ বন্দনার ঘটনা আজো বিশেষভাবে চিহ্নিত আছে এই কারণে যে, শচীদেবী সেদিন তাঁর

একমাত্র অঞ্চলনিধিকে মানবকল্যাণে সন্ন্যাসের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তাই কবি করুণানিধান তাঁর জন্মস্থান শান্তিপুরের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় লিখেছেন -

নীল গাঙে তোর আলোর খেয়া ডাক দিয়েছে আজ মোরে—
জল ভরে মা, মনের চোখের কূলে।
লুটিয়েছি মা তোর মাটিতে, কাঁচা সোনার কৈশোরে,
ফল্‌ত ফসল কান্না-হাসির ফুলে।
ধন্য হলাম মাথায় তুলে, গায়ে মেখে তোর পা'র ধূলি,
স্নেহের পরশ বুলিয়ে দে মা প্রাণে।
কাঁপছে বুকে সুদূর যুগের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি,
স্মৃতির কোকিল ডাকৃছে মিঠে তানে।
...
তোর মাটি মা, দিব্য মাটি—অদ্বৈতের তপঃস্থল,
'ধূলোট্' ধূলোয় উঠ্‌ল রে নাম-গান,
এই মাটিতে পড়্‌ল ঝরে সোনার গোরার অশ্রুজল,
ছাপিয়ে 'নদে' এল প্রেমের বান।
...
পূজ্য তুমি পুণ্যভূমি, অন্নদা মা ইন্দিরা,
আজকে তোমায় বন্দিছে এই দীন,
কোথায় এমন শান্তি ঢালে সন্ধ্যারতির মন্দিরা?
কে পরিশোধ করবে মা তোর ঋণ!

কৈশোর থেকেই আমি গভীর আগ্রহে কবি করুণানিধানের কবিতা পড়ে থাকি। কারণ মাটি আর মানুষ তাঁর কবিতায় একাত্ম হয়ে আছে। তাঁর কবিতা স্নিগ্ধ শান্ত ও সৌন্দর্যময়। কবির সৃষ্টির সঙ্গে আমার যে পরিচয় ছিল, কালক্রমে যৌবনে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার সময়, কবির সঙ্গে আমার পরিচয়লাভের সৌভাগ্য হ'ল। আর সেই সঙ্গে বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হ'ল। পরম স্নেহে অগ্রজ কাছে টেনে নিয়েছিলেন। যখন তিনি বিডন স্ট্রীটের, কেউ কেউ বলেন সেণ্ট্রাল এভেনিউ, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন বিডন স্ট্রীটে 'নেচার কিওর হোম'এর পাশের বাসায় থাকতেন, সে সময়ে প্রায়ই তাঁর কাছে গিয়েছি। তার অকৃপণ স্নেহধারায় সিঞ্চিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তার পর সুদীর্ঘকাল তাঁর স্নেহভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। আজ শতবর্ষে তাঁকে স্মরণ করে মনে হচ্ছে, তাঁর স্নেহ-ছায়াতলে আর একবার অবগাহন করার মতো সুযোগ লাভ করে ধন্য হলাম।

চিঠির শেষে নিত্য আশীর্বাদক লিখে যিনি চিঠি শেষ করতেন, সে আশীর্বাদ তো সমসাময়িককালের গণ্ডিতেই আবদ্ধ নেই, সে যে নিত্যকালের।

পিতৃব্য তর্পণ

জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

কবি করুণানিধানের নিকট পিতৃব্যের স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়ে আমি ও আমার ভাইবোনেরা ধন্য হয়েছি। তাঁর সেবা-পরিচর্যার আনন্দে আমরা গৃহের সকলেই কৃতার্থ হয়েছি। সবস্থানই তাঁর গৃহ, সবাই তাঁর পরিজন। আমাদের গৃহ ও মন তাঁর নিরন্তর 'সীতারাম' নামে ও উজ্জ্বল হাস্যে নন্দিত ও মুখরিত হয়েছে। বালক যুবা বৃদ্ধা সবাই তাঁর সঙ্গী, পরিচিত অপরিচিতে প্রভেদ নেই। তাঁকে স্মরণ করলে মনে আসে হরিদ্বারের গঙ্গা স্নেহপ্রীতির গতিময়, মধুময়, নির্মল তরঙ্গহীন স্রোত। আর কবিরা যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়।

আইন কলেজে যখন পড়ি, ১৯২৮ সালে বাবা তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকলেজের পাঠাগারে, তাঁর কর্মস্থলে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চার এই ভাবে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। আইনকলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচীর কামরায় অপরাহ্নে আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন, এম এ. আর ল পড়ি। ডক্টর বাগচী অঙ্কে আইনে সাহিত্যে মহাপণ্ডিত বলে গণ্য ছিলেন। দেশ বিদেশে তাঁর খ্যাতি। বহু বিদেশী ভাষায় বুৎপত্তি। পরিচয় মাত্রেই বলে উঠলেন—'তোমাদের অধ্যাপকরা কি বাংলা সাহিত্য না পড়ে বই লেখেন ? একশজন বাঙালী লেখকের বইয়ের তালিকায় করুণা আর তোমার বাবার বইয়ের নাম নেই।' তিনি ছিলেন কবি করুণানিধানের বিশিষ্ট বন্ধু ও দেশ বিদেশের সাহিত্যের সমজদার। ডক্টর বাগচী, জ্যেঠামহাশয় ও ডাঃ নিমাই দাস আইনকলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে প্রায় প্রতিদিনই সাহিত্য নিয়ে অপরাহ্নে আলোচনা করতেন।

এর পর এলো আমার বিয়ের সময় তাঁর আশীর্বাদ। বিয়ের কবিতা নিয়ে এর আগেই বাবা ও জ্যেঠামশায় একবার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আমার এক মামা ৺নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের বিয়ে হয় শান্তিপুরে। বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের দুটি কবিতার চমৎকারিত্ব নিয়ে বেশ আলোড়ন হয়। প্রকাশ হয়ে পড়ে যে বরের পক্ষের কবিতার রচয়িতা কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কন্যাপক্ষের কবিতাটি রচনা করেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার বিবাহে তাঁর রচিত আশীর্বাদী কবিতা নীচে উদ্ধৃত করছি।

আজি এই পরিণয় বাসরের দীপালি উৎসবে
আনন্দবাঁশীর গানে, মিলনমঙ্গল শঙ্খরবে,
জীবনসঙ্গিনী সনে শুভদৃষ্টি হোক সম্মোহন।
প্রীতিপদ্ম পরিমলে পুণ্য হোক রাখীর বন্ধন।

হে নবীন জায়াপতি জয়যুক্ত হও সর্বকাজে
পথের সে কুশাঙ্কুর কভু যেন চরণে না বাজে।
নতি কর বিধাতায়, এ মাল্য চন্দন তাঁরি দান,
থাকো গো মনের সুখে, মিশে যাক যুগল পরাণ।

পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভায় কলেজ স্কোয়ারে। কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। সেই আন্তরিকতা ও ভক্তিসম্মানের দৃশ্য এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শান্তিপুরবাসীগণ শান্তিপুরে তাঁর একটি বাসগৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য করেন। সেখানেই তাঁর অবসর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করলেন। সামান্য পেনসেন পেতেন। গীতা ও ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করলেন।

'গীতায়ন' রচিত হলো, কিন্তু তিনি শান্তি পেলেন না। তাঁর সামান্য পেন্‌সেন এলেই অনেকে কাজে সাহায্য করার নামে উত্যক্ত করতো। বাবার চিঠি পেলাম যে তিনি আমাদের গ্রামের বাড়িতে বাবার কাছে এসে থাকবেন। বাবা তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু লিখলেন যে পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট ও অসুবিধা হবে তাই আমাদের কর্মস্থলে কয়েক মাস কাটাতে হবে। আমি তখন কাঁথিতে। গ্রামে কিছুদিন থাকার পর জ্যেঠামশায়ের পরিব্রজ্যা আরম্ভ হলো। বাবার চিঠি এলো তিনি কাঁথি আসছেন। তাঁকে পেয়ে আমরা বাড়িশুদ্ধ খুব আনন্দিত। আমার ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর সকাল বিকেলের সঙ্গী। নানান প্রকারের খাবার তৈরি করায় তাদের মাকে দিয়ে, যা যা তিনি ভালোবাসেন। ছোটছেলে তাঁকে গ্রামে থাকতে দেখেছিলো। তাঁর প্রিয় তেলেভাজার কথা তুললে এখানে বলতেন—'বলো না, বাবা বকবে, এখানে পোলাও মাছের চপ্‌ বলো।'

সবেই আনন্দ—সব আস্বাদেই অমৃত আস্বাদ।

আমার বাড়িতে আড্ডা বসতো। কাঁথি কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক আসতেন সন্ধ্যায়। গানে আলোচনায় আসর জমে উঠতো। তাঁর মুখে সর্বদা 'সীতারাম'। অনেক চিঠি আসতো তাঁর কাছে। কিছু পড়ে শোনাতেন। একদিন এলো সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি—তাঁর পিতার গ্রন্থ প্রকাশ করবার ইচ্ছা—ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছেন, তাঁর পিতার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা উল্লেখ করে। পাটনা যাত্রার প্রাক্কালে লেখা এই চিঠি—নিজের জীবনের অনিশ্চয়তার পথের কথা আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করে।

কাঁথিতে অনেকদিন একসঙ্গে কাটে। কাঁথিবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। একজন অশীতিবর্ষ উকিল আবেগভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন কবির 'কুণালকাঞ্চন'। যখন মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কবিতাটি কি গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল তার উল্লেখ করলেন। শ্রীমদনমোহন

কুমার তাঁর বইয়ে আমাদের বাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ও কবির কাঁথিতে থাকাকালীন খবরগুলিও যত্নসহকারে সন্নিবেশিত করেছেন। চিঠিপত্র যা দিয়েছিলাম তা এখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে জমা আছে।

ঐ সময় কবির অত্যন্ত স্নেহভাজন তরুণ কবি প্রশান্ত বাগচী কবির নিমন্ত্রণে আমার গৃহে কিছুদিন একসঙ্গে থাকেন। আমি তখন চীনে কবিতার বই একটি পড়ছি। প্রশান্তকুমার কয়েকটি কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেন। একটি দীর্ঘ কবিতার (বোধহয় Tao ird lew) অনুবাদ এবং নায়িকা Lan Chi র কাহিনী অতি মর্মস্পর্শী হয় এবং কবিরও তারিফ পায়।

একসঙ্গে আমরা দীঘা দর্শনে যাই। প্রথমেই সমুদ্র দেখে বললেন—'হ্যা জ্যোৎস্না, এ যে বাঙালী সমুদ্দুর।' দীঘার সমুদ্র কি করে পারবে পুরীর সমুদ্রের সঙ্গে, যাকে দেখে 'শ্রীক্ষেত্রে' কবিতায় লেখেন—

'হে মহার্ণব, নীল-ভৈরব গর্জন-জলভঙ্গে,
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান তুলিতেছ কার বন্দনা-গান?
নন্দিঘোষ উদ্বোধনের দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।'

প্রশান্তর সুমধুর রবীন্দ্রসঙ্গীত সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে হারিয়ে যেতে লাগলো। আমরা উঠেছিলাম Irrigation ডাক বাংলোয়। প্রাঙ্গণের ঝাউ গাছ দুটি গভীর রাত্রে কবির চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয় আগের জন্মে তারা দুটি প্রেমিক ছিল। সমুদ্রের হাওয়ায় তাদের পাতার মর্মরে বিরহের ক্রন্দন। কোনো কাহিনী জড়িত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। Warren Hastings তাঁর প্রণয়িনীকে নিয়ে দীঘার তখনকার একটি বাংলোয় ছিলেন শুনেছিলাম, তা বললাম। সেটি এখন সমুদ্রগর্ভে। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করেছিলাম সেই ঝাউগাছ দুটির দিকে তাঁর আনমনা উদাস দৃষ্টি।

যতদিন আমার বাড়িতে ছিলেন সন্ধ্যায় আলাপ-আলোচনা চলতো— সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাশৈলী নিয়ে, আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে, বহুকথা বলে যেতেন। এর মধ্যে দশদিনের ডায়রীতে তাঁর কিছু কথা সংক্ষেপে লিখে রাখি। 'অক্ষর-সঙ্গীত' সম্বন্ধে প্রায়ই বলতেন। তাঁকে এইটি প্রবন্ধাকারে লিখতে অনুরোধ করি। নিজে লেখার অনিচ্ছা, তাই দুতিন দিন ধরে তিনি বলে যান আর আমি লিখে নিই। পরে সজনীকান্ত দাস মহাশয় জানতে পেরে আমাকে সেটি পাঠিয়ে দিতে বলেন। জ্যেঠামহাশয়েরও চিঠি পাই। লেখাটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত তাঁর কথা যা সংক্ষেপে লিখে রেখেছিলাম সেগুলির এবার উল্লেখ করছি।

১) 'তোমার বাবা আত্মভোলা কবি। আমরা কত পড়েছি। রবিবাবু আত্মভোলা না, আমিও না। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র পড়েছি সব। কবিতা

পড়ে লোকে বলবে 'প্রতিভা', তার পিছনে যে কত খাটনী আছে কে জানে! তোমার বাবা born poet। সোমনাথ নিয়ে classic কবিতা লিখছে। নিজেই জানে না কি লিখছে।' (২০. ২. ৪৯)

২) 'তন্ত্র নিয়েও লিখেছি। Woodroffeএর তন্ত্র পড়েছি। তন্ত্র বলে স্বর আর রং এক'। সরস্বতীর মন্ত্র পড়ে তৃতীয় কথাতেই মুকুট টুকুট সব মিলিয়ে যায়। শুধু আলো, শ্বেত জ্ঞানের আলো। গীতার অনুবাদ করছি। ভাগবত পড়ি, দশম স্কন্দ সাহিত্য হিসাবে। চণ্ডীর কবিত্বই অপূর্ব।

১৪ বছর আগে চিত্রকূটে রামধুন পাই। 'বিচিত্রা'য় লিখি। রবিবাবু বললেন—'কি পেয়েছে যেন'!

'চিত্রকূটে' কবিতার দুটি পঙক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। 'সীতারাম' নাম ওখানেই প্রথম পান এবং শেষ জীবনের সম্বল করেন এই নামই।

'জয় সীতারাম'—বনের চন্দনা টিয়া গায় অবিরাম;
গিরি-সংকটের মুখে বারির আরশি বুকে
ধরেছে মূর্ছিতা নদী, মন্দাকিনী-নাম।…
'সীতারাম কহ' নাম-মূর্তি শান্তি-মন্ত্র স্মর অহরহ,
তিমিরের হবে ক্ষয়, হেরিবে অরুণোদয়,
কেন মিছা ভ্রান্তিবশে অন্তর্দাহ সহ?

'আমার অদ্বৈতবাদ। পরিবর্তনই কাব্য। রূপরসগন্ধস্পর্শের নিত্যনূতন রূপ। গীতায় মাথা খারাপ হয়ে যায়। অনাসক্তি যোগে কাব্য হয় না।'

(২১.২.৪৯)

'রক্ষাংসি ভীতানি দিশোদ্রবন্তি'—মধুসূদন সরস্বতীর টিকায় একে মন্ত্র বলা হয়েছে। এ মন্ত্র উচ্চারণে সকল বিপদ পালিয়ে যায়।' (২৮ ২.৪৯)

'রস সৃ ধাতু হতে—যা সরে তাই রস। পরিস্থিতির ঘন ঘন পরিবর্তন প্রয়োজন। ভাবের সহচরত্বই কাব্য। গীতার বিভূতিযোগও কাব্য। গীতার

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।
—শ্রেষ্ঠ কাব্য সংস্কৃত আলংকারিকগণের মতে।' (১লা মার্চ)

৩) 'কারোয়ার সমুদ্রতটে রবীন্দ্রনাথ প্রেমে পড়েন। ও দেশের একটি মেয়েকে বিয়ে করবো ঠিক করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর কবি বংশমর্যাদাকে উপহাস করে অভিমান ভরে বলেন—'আমি কালোমেয়ে বিয়ে করবো।' আগে তাঁদের এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন, তাঁর মেয়ে। বড় গুণবতী।' (২৭. ২. ৪৯)

৫) 'অবাস্তব লিখি নাই। সত্যেনের life (মনে করে) 'বাদশাজাদী' কবিতা লেখা। বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করতে নেই।

'নয়ন মুদি ঝর্ণা ঘুমে কোমল ঘুমের অঞ্জনে।'

—দার্জিলিং-এর অনুভূতি। মাতাল হয়ে যেতাম—তরুলতা লালফুলের দিকে হা করে থাকতাম। দেওঘরে পাহাড় দেখে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা হতো। যদি জানতাম কি হবে, তা হলে কি করতাম।' (২৩. ২. ৪৯)

''ভুল' কবিতায় Arabian Nightsএর spirit কাব্যে রূপ দিলাম। আবেশ হয়। আবার গতির সঙ্গে স্থিতি চাই নইলে পড়ে যেতে হবে।

বিমল ঘোষকে বল্লাম, এই বর্তমান যুগকে, মানুষের মনকে রূপ দাও। বলে, দানা বাঁধে নি। তাকে বলি, ইউরোপে war poetry হলো কি করে?

সত্যেন্দ্রর 'তাজমহল' শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন একটা ভালোবাসার কথা লিখতে পারো নি?' (২৪. ২. ৪৯)

৬) 'ইংরাজি কবিতা না পড়লে কবিতাই লিখতে পারতাম না। ইংরাজি কাব্য grammar না জানলেও বুঝা যায়। ইংরাজি থেকে Assonance, vowel alliteration পেয়েছি।' (২৫. ২. ৪৯)

'বসন্তবিলাস' Young Lochinvar এর ছন্দে লেখা (২৭.২.৪৯)। তুলনার জন্যে 'বসন্ত বিলাস' কবিতার ও Scottএর Young Lochinvarএর কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

'Lochinvar

O young Lochinvar is come out of the west,
Through all the wide border his steed is the best;
And save his good broadsword he weapon had none,
So faithful in love, and so dauntless in war,
There never was knight like Young Lochinvar.

'বসন্তবিলাস'

আজি ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ ফুটল?
কেন কিংশুক ফুল চীন-বাস গায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল?
পিক পঞ্চম গায়, বয় দক্ষিণ বায়,
নাচে ফুল-হিন্দোল, ছন্দের দোল, ঘোম্‌টার জের টুট্‌ল।

'বালুকায়' এই কবিতায় Olive Shreinerএর Dreamsএর প্রভাব। 'বাদাশাজাদী'তেও।

Olive Shreinierএর একটি বই আছে Journey To An African Farm। যে যে লেখায় প্রভাব পড়েছে সেগুলি নীচে দিলাম।

বালুকায়

ধূসর মরুতে চলিয়াছি আশা আঁকিয়া,
বালুকায় লেখা বালুকায় যায় ঢাকিয়া।

বাদশাজাদী 'তু-কু'জ্-ওলা উট চড়ে যায় হাব্‌সী যুবতীরা।' (২. ৩ ৪৯)

৭) 'রবীন্দ্রনাথে alphabet music আছে। তন্ত্রে আছে। শ্রুতিমধুর ভাষায় মনের উপর প্রভাব, প্রতিকূল অক্ষর ব্যবহার না করা। মধুর ত বর্গ, ব, ল, স, ক। কঠোর খ, ছ, ঠ, থ, ট বর্গ। (২২. ২. ৪৯)

শব্দ শেষ নয়, alphabet চরম। তন্ত্রে বলা আছে অক্ষরের কথা। আলংকারিকরাও বলেন কোন অক্ষর বর্জনীয়। (২৫. ২. ৪৯)

Alphabet music পাই Benn's Rhetoric-এ। রামেন্দ্রসুন্দরের sound (পড়েছি)। Hetmoltz-এর sound (পড়েছি), হরিহর শাস্ত্রীর লেখা মাসিক বসুমতীতে পড়েছি। মম্মট ভট্ট, নারদপঞ্চরাত্র পড়েছি। (২৬. ২. ৪৯)

Helmoltz-তে পাই Alphabets are made of notes, অক্ষর harmony। ভারতীয় সঙ্গীতে melody। (২. ৩. ৪৯)

'শেষ বাসরে'—alphabet music (২৬. ২. ৪৯)

উপরোক্ত কবিতা হতে উদাহরণ হিসাবে কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রুধারায় আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায় সোহাগ-ভরে।...
প্রভাতে প্রদোষে সুখে দুখে মোর
পরায়ে দিয়েছ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণভরা কঙ্কণ-পরা দুখানি করে—
এস সখি আজি যৌবন-স্মৃতি শেষ-বাসরে।...
অয়ি মঙ্গলা, আলয়কমলা ভুলালে মোরে।

'শব্দের বিন্যা নূতন দিতে হবে। সত্যেন্দ্র শেখে নি alphabet music ও imagery। আসক্তি ভাবের sequence। (২২. ২. ৪৯)

ভাবকে পরস্পর সাজাতে হবে। সামঞ্জস্য দরকার। সহিত ভাব—শব্দের ও অর্থেরও। কাব্য Art হলো।'

এই সম্পর্কে তাঁর 'অক্ষর-সঙ্গীত' প্রবন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা আছে, সেখান থেকে কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করছি।

'এই যে উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রস, ইহা প্রকাশের পক্ষে অনুকূল অক্ষর নির্দিষ্ট আছে। র, ল, ত, থ, দ, ধ, ন, স, ঋ, ৯, ও ঞ, ণ, ন, ম—এই গুলি শ্রুতি মধুর বর্ণ। 'র' সকল রসের দীপন করে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার নাম 'অগ্নিবর্ণ'। 'ম' মধুরতম অক্ষর।...'

'তিনটি ভাব পাশাপাশি বসাইলে তাহাদের একাসনে বসিবার যোগ্যতা বা আভিজাত্য আছে কি না দেখিতে হইবে। ইহারই নাম 'আসত্তি'। সাংখ্য-দর্শনে এই আসত্তির কথা বিশেষ করিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এই 'আসত্তি'ই সাহিত্য নির্মাণ করে।...'

'কবিতা একটি চিত্রশালা। রসেরও ইহা রসশালা। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি এই রসেরই উৎপাদক। একখানি ছবির পার্শ্বে বা পরে কোন ছবিখানি সাজাইলে মনোরম হয়, মনোহারিত্ব জন্মে, তাহা কবিরা প্রতিভাবলে অবগত হন। সেই প্রতিভাও শিক্ষার দ্বারা সুসংস্কৃত হয়। Art is to conceal the art.'

কাঁথি ছেড়ে চলে যাবার আগে আমাকে একটি ভাগবত পড়তে দিয়ে গেলেন। যাবার আগের দিন ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের দাদুর জন্যে সাবান, তেল প্রভৃতি ও তাঁর বাক্সের জন্যে একটি নূতন তালাচাবী উপহার দিল। সন্ধ্যায় আমি সেদিন পাশের ঘরে কাজ করছিলাম। আমাকে ডাকছেন শুনলাম বার বার। আমি গিয়ে দেখি যে তাঁর চোখ ঝকঝক করছে। ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসে। সামনে একটি সদ্য লেখা কবিতা। জ্যেঠামহাশয় উদ্দীপিত কণ্ঠে বললেন—'তোমার ছেলেমেয়েরা আমাকে আবার কবিতা লিখিয়েছে—জীর্ণ তালা ভেঙে দিয়েছে। আবার কবিতা লিখেছি। আমি এই কবিতাটা তাদিকে উপহার দিলাম। শোনো।'

নতুন দোলা

অনেক জিনিস উপহার দিয়ে সখা ও সখীরা সবে
নন্দিল মোরে বরণের কলরবে।
পরাইয়া দিল ফাগুয়ার রাঙা হার।
এত বড় নয় নোবেল পুরস্কার।
সাধ নাহি আর বাহবা নেবার
নাই কোনো নিধি পাহারা দেবার,
নাই কোনো চাওয়া, নাই কোনো পাওয়া,
উদাসীর প্রাণে দক্ষিণা হাওয়া
জাগিল আর একবার।
কি দিব তোদের প্রত্যাভিনন্দন ?
পর প্রেমহার কুঙ্কুম চন্দন।
ওরে জ্যোৎস্নার দুলাল দুলালি
না জানি কি দিয়ে মনটি ভুলালি
ওরে কুমুদের মালা !
পাঠালি সাগরে ঢেউয়ের মেলায়
কেয়াগাছে ঘেরা ডাকবাংলায়
জরার দরজা খুলে দিলি তোরা
ভাঙিয়া জীর্ণ তালা।

করুণাকাকা

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বহুদিন পরে এক সরল, নিরহঙ্কারী সাধারণ মানুষকে মনে পড়ল। মনে পড়ল তাঁর শীর্ণ শরীর, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আর শ্মশ্রু-শোভিত হাসিমাখা মুখ। মনে পড়ল তাঁর আচরণ আর আলাপনের মধ্যে একটা নিজস্ব পরিবেশের আস্বাদ। সেই মানুষটিকে তাঁর জন্মশতবর্ষে আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সেই মানুষটি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাদের করুণাকাকা, পরিবারের হিতৈষী স্বজন।

আমার জন্মের বহু আগে থেকেই করুণাকাকার সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, যেমন ছিল চারুচন্দ্র মিত্র শরৎচন্দ্র ভড় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে। আমার বাবা স্বর্গগত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এঁরা সকলেই বাল্যবন্ধু, প্রায় সমবয়স্ক ও নিকট-প্রতিবেশী। হেদুয়ার এপার আর ওপার।

আমার খুব ছেলেবেলায় আমরা মানিকতলা থেকে তেলিপাড়ায় আসি। খুব সম্ভবত সেটা ইংরেজি উনিশ কি কুড়ি সাল। আমরা তেলিপাড়ায় প্রায় সতেরো-আঠারো বছর থাকি। তেলিপাড়ায় থাকাকালীন করুণাকাকারা কিছুদিনের জন্যে তেলিপাড়ার পাশেই রামধন মিত্রের লেনে একটা বাড়ির তিন তলায় সপরিবারে থাকতেন। সময় পেলেই তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন আর বাড়ির সকলকে নিয়ে মজলিস করে বসতেন। আমরা অবশ্য সে-সব আসরে থাকতুম না। অবশ্য করুণাকাকার ছেলে বাসুর খেলার সাথীর অভাব তখন আমাদের বাড়িতে ছিল না।

শেষের দিকে বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন—তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, তবে খুব কম। বাবার মৃত্যুর (১৯৪০) পরও কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখন আমার কাকার সঙ্গেই বেশির ভাগ আলাপ-আলোচনা করতেন। এই উপলক্ষে একটা পুরোনো কথা বলি। আমার স্বর্গগত কাকা ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন এবং করুণাকাকা এলেই তিনি প্রায়ই একখানা খাতা নিয়ে তাঁর কাছে বসতেন আর কবিতা শোনাতেন। কাকাবাবুর জিম্মায় তিনখানা সোনালী জলে নামছাপা বাঁধানো হাতে লেখা মাসিক-পত্রিকা ছিল। বর্তমানে আমার কাছে তার একটা সংখ্যা ছিন্ন অবস্থায় আছে। কাকাবাবুর মুখেও শুনেছি তখনকার কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধু মিলে এই হাতে-লেখা পত্রিকাখানি পরিচালনা করতেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন চারু জেঠামশাই, আমার পিসতুত ভাই সাতকড়ি মিত্র, বামাচরণ চন্দ্র প্রভৃতি

আরও অনেকে যাঁদের নাম এখন মনে নেই। করুণাকাকাও সেই দলে ছিলেন। এই হাতে-লেখা পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় অনেকগুলিই তাঁর কবিতা বেরোয়। আমার কাছে যে সংখ্যাটি আছে তার একটা বিবরণ দিচ্ছি ও করুণাকাকার একটা কবিতা তুলে দিচ্ছি —কালো কাপড়ে বাঁধানো একসারসাইস বুকের মতো সাদা পাতার খাতা। চারপাশে লাল মার্জিন টানা। মলাটে সোনালী জলে লেখা—

তটিনী।
১৩০৯ সাল, আশ্বিন।
মাসিক পত্রিকা

প্রথম পাতায়

তটিনী।
১৩০৯ সাল, আশ্বিন।

তটিনী   মাসিক পত্রিকা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং
বামাচরণ চন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত।
কলিকাতা
১৩০৯ সাল

দ্বিতীয় পাতা—

তটিনী।
(১৩০৯ সাল, আশ্বিন।)
এই সংখ্যায় লেখকগণের নাম।

শ্রীরাখালদাস রায় বি এ   শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়   শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র ও
শ্রীসাতকড়ি মিত্র।

তৃতীয় পৃষ্ঠায়—

চতুর্থ পাতায়—পত্রিকা আরম্ভ। প্রবন্ধের নাম দূরদৃষ্টি। লেখার চারিধারে লাল কালির লাইন টানা। পত্রিকাটি ২৪৭ পৃষ্ঠা হতে ২৯৪ পৃষ্ঠা—মোট ৪৮ পৃষ্ঠা। প্রতি পাতার চারধারে লাল কালির লাইন আছে আর মাথার দিকে

একটা লাইন বেশি আছে—তার ভেতরে বাম দিকের পাতায় পৃষ্ঠা সংখ্যা আর তটিনী—ডান পৃষ্ঠায় বিষয়ের নাম আর পৃষ্ঠা সংখ্যা। লেখা স্পষ্ট, ধরে ধরে লেখা। পত্রিকার প্রথম তিনটি পর পর প্রবন্ধ ও পরের পাঁচটি কবিতা।

প্রথম কবিতার নাম—'পাগলের গান'। এই কবিতাটি করুণাকাকার লেখা। প্রবন্ধ বা কবিতাগুলির গোড়ায় বা শেষে লেখকদের নাম নেই। এই চার জন লেখকদের মধ্যেই তিনটি প্রবন্ধ ও পাঁচটি কবিতা লেখা হয়েছিল। আমার কাকাও কবিতা লিখতেন তাঁর কবিতা এর আগের সংখ্যায় ছিল— সেটি তাঁর কাছেই ছিল। তাঁরই মুখে শুনেছি প্রথম ও আর একটি কবিতা করুণা-কাকার। বাকি তিনটি কবিতা লেখকের নামও বলে ছিলেন— এখন মনে নেই। করুণাকাকার লিখিত এই মাসিকে প্রথম কবিতাটি এখানে প্রকাশ করছি। এটি তাঁর কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি না। তবে তাঁর 'প্রসাদ' 'ঝরাফুল' বা 'শান্তিজল' বইয়ে নেই, তা আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি।

পা গ লে র গা ন

ওগো সে কি মোর হবে না
আমার কুসুম সুরভি কি তার
বেণী বন্ধনে রবে না
হাতের নোয়ায় সিঁথির সিন্দূরে
সোহাগে সাদরে সরসে মধুরে
সে কি পূজিবে না পরাণ বঁধুয়ে সাধিয়া
ব্যাকুল বক্ষ বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া।

পাগল করেছে কাজল নয়ন
অশ্রু আলোকে ভরিয়া
কিছু যে বোঝে না! অকুণ্ঠিতায়
বুঝাব বল কি করিয়া?
যার গৌরবে গর্ব আমার
যার অধিকারে মোর অধিকার
মরণ-বাঁচন শুভাশুভ যার আমার সাথে
তাহারে সঁপিবে আজিকে বন্ধু কাহার হাতে?

আজিকে রজনী বজ্র-উজল
লুপ্ত জ্যোৎস্না তারকা
দিক্ দিগন্তে গর্জে ঝঞ্চা
পুষ্প উজল করকা

আজ বাঁশীহীন যমুনার তীর
নাচিছে লহরী মত্ত মদির
পাগল পরাণ বেদনা অধীর গৃহের কোণে
আজিকে রূপসি, মোহন মিলন তোমার সনে।

আজ চলে এস ত্বরা ছুটে এস দুয়ার খুলে
চঞ্চল চোখে সিক্ত বসনে সিক্ত চুলে
আজিকে সুখের নাহিরে অন্ত
আজিকে দুখের নাহিরে অন্ত
চরম সৌখ্য পরমানন্দ আঁখির কূলে
মিশেছে আজিকে স্বপনে সত্যে মরমে ভুলে
আয় ছিঁড়ে আয় কূলবন্ধন
পিছে পড়ে থাক্ মিছে ক্রন্দন
হাসুক উষার কনককেতন গগন মূলে।

গঙ্গা আজিকে উদার গভীর ফেনায় ভরা
এসেছে তুফান নিখিলের প্রাণ পাগল করা
এস এই খানে তুমি আর আমি
বসি দুজনায় ডাকি জলে নামি
মেঘের ছায়ায় শীতল সলিলে সাঁতার কাটি
খুঁজি দুজনায় পরশ পাথর সোনার বাটি।

আজি এস তুমি নিখিল সুষমা অঞ্চতলে লুকায়ে
প্রবাহিয়া এস নিখিলের আঁখি শুকায়ে
বাজুক কাঁকন সোনার নূপুর
নাচুক মেখলা কনক মুকুর
বিম্বিত হোক মেঘের আড়ালে
কিরীট কিরণ মাখি
ঝলসিয়া যাক জগৎজনের আর্ত অন্ধ আঁখি।

ইহজন্মের পরজন্মের তুমি বাঞ্ছিত তমে
তুমি অন্তরে কল্পব্যাপিনী অয়ি অন্তর রমে
প্রণয়ে কলহে তিমিরে কিরণে
মিলনে বিরহে জনমে মরণে
তুমি মোর ধ্রুব হে নিরাভরণে হে নিরুপমে
ভুবনে ভুবনে বাজায়ে বীণ
ভ্রমিব দুজনে রজনী দিন

শুধিব তোমার প্রেমের ঋণ
যতনে সাদরে এ দীন হীন নূতন প্রেমে
হে প্রিয়তমে
হে নিরুপমে।

বাবার সাহিত্য-সাধনার সূচনা থেকে শেষজীবন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে বহু সুধী ব্যক্তির সমাগম হত প্রায় প্রতিদিনই সকালে এবং সন্ধ্যায়। তিনি বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বলেই প্রায় সকল গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনে (বাবার প্রতিষ্ঠিত ১৯০১ সালে) একবার সাহিত্যানুরাগীদের একটি ছবি তোলা হয়—তাতে করুণা-কাকাও ছিলেন। সেই ছবিটি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনের পর ১৩৩৬ সালের পঞ্চপুষ্পের কোনো এক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ছবিখানি পুনরায় আমি এখানে প্রকাশ করছি (ছবিখানি ডক্টর মদনমোহন কুমার মহাশয়ের করুণানিধান সম্পর্কে-সংকলনের সময় তাঁকে একবার দিয়েছিলুম)। ছবিখানিতে যাঁরা যাঁরা আছেন তাঁদের নামও এখানে উল্লেখ করছি।

উপবিষ্ট—১। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৯-১৯২৯। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। বহু গল্প ও কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। মাসিক সাধনা সম্পাদক।

২। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৩-১৯৬৪। ঐতিহাসিক, শিশুসাহিত্যিক ও বিক্রমপুর, শিশুভারতী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক।

৩। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ১৮৭৯-১৯৪০। ভাষাবিদ্ পণ্ডিত, পুরা-তত্ত্ববিদ ও বাণী সঙ্কল্প, ভারতবর্ষ, মর্মবাণী, পঞ্চপুষ্প প্রভৃতির সম্পাদক।

৪। বালক-সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০১-১৯৭৪। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। বাগ্মী, গ্রন্থকার ও রাজনৈতিক নেতা।

৫। চারুচন্দ্র মিত্র। ১৮৭৭-১৯৪২। আইনজীবী ও সাহিত্যিক ও বহু সাময়িক পত্রের সহ-সম্পাদক।

৬। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৭-১৯৫৫। কবি ও কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

৭। ব্যোমকেশ মুস্তফী। ১৮৬৮-১৯১৬। প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফীর পুত্র। সাহিত্য, কল্পদ্রুম প্রভৃতি কয়েকটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক। বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের শিশুকন্যা সহ।

পেছনের সারিতে—৮। দ্বারবানের ছেলে

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯১ ১৯৫২। ঐতিহাসিক গবেষক ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

১০। মঙ্গলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। অকালেই মারা যান।

১১। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত জাহ্নবী সম্পাদক ও কান্তকবি রজনীকান্ত, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

১২। সুরেশচন্দ্র নন্দী। ১৮৯০-১৯৫৭। প্রাবন্ধিক ও 'ওমর খৈয়ম' 'শেখসাদী'র জীবনী লেখক।

১৩। মোহিতলাল মজুমদার। ১৮৮৮-১৯৫২। কবি, সমালোচক ও সাহিত্যিক। কাব্যগ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থের রচয়িতা ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক।

১৪। এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের দ্বারবান।

আর একটি অত্যাশ্চর্য অলৌকিক কাহিনীর কথা আজও আমাদের মনে পড়ে।

করুণাকাকার জীবনে একটা অবিস্মরণীয় শোকাবহ ঘটনা ঘটে ছিল—যে ঘটনা তখনকার দিনে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে প্রবল বিস্ময় জাগিয়ে তুলে ছিল। তখনকার সাহিত্যিক মহলেও তা প্রচার হয়ে ছিল। আমি কাহিনীটা তাঁর নিজের মুখে শুনি নি বটে—তবে আমাদের বাড়িতে মা-পিসিমা-কাকিমাদের কাছে বহুবার শুনেছি এবং যখনই আমাদের বাড়িতে কোনো আত্মীয়েরা আসতেন তখনই তাঁদের এ কাহিনী বহুবার শোনাতেও শুনেছি। পূজনীয় জলধর সেন, চারু জেঠামশাই, বাবা প্রভৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা করতেও শুনেছি। যদিও কাহিনীটা পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা তবুও কাহিনীটা এখনও আমার বেশ মনে আছে।

করুণাকাকার এক ভাই (কি রকম ভাই ঠিক মনে নেই) সবু কি সমু বলে ডাকতেন, চুঁচড়োয় কাজ করতেন। সেখানে কয়েকজন মিলে একটা মেসে থাকতেন। প্রতি শনিবার ছুটির পর কলকাতায় করুণাকাকার বাড়িতে আসতেন আর সোমবার সকালে খাওয়া-দাওয়া সেরে চুঁচড়োয় কাজে ফিরে যেতেন। এটা তাঁর একটা সাপ্তাহিক নিয়মের মধ্যে ছিল। সেবার শনিবার কিসের ছুটি ছিল, তাই শনিবারে না এসে শুক্রবার রাত্রে কলকাতায় দাদার কাছে এসে হাজির। শুক্রবার গল্প-গুজব, খাওয়া দাওয়া করে রাত্রে নিজের নির্দিষ্ট ঘরে যান। শনিবার সকালে বেরিয়ে দুপুরে ফিরে আসেন। দুপুরে আহারাদি সেরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে সারাদিন বাইরে বাইরে কাটান। রবিবারেও ঠিক একইভাবে সময় কাটান। রাত্রে বেশ গল্পগুজব আনন্দ করে রাত কাটিয়ে যথারীতি সোমবার সকালে দাদার সঙ্গে দুচারটে কথা বলে চলে যান। এ তো স্বাভাবিক ঘটনা, প্রতিবারেই তো এরূপ হয়, এতে তো কোনো নতুনত্ব নেই—ভাববার, চিন্তা করবার কিছু নেই, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল।

ভাই চলে যাবার পর করুণাকাকা বেরিয়েছিলেন কেউ বলেন আমাদের বাড়িতেই এসেছিলেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে দেখেন এক পোস্টাফিসের পিওন এক টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির। টেলিগ্রাম তাঁর নামে। টেলিগ্রামটি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন। পড়েই বিচলিত হয়ে পড়লেন। টেলিগ্রামে আছে—আপনার ভাই···গত শুক্রবার সন্ধ্যায় কলেরারোগে হাসপাতালে মারা গেছেন। টেলিগ্রাম পড়ে তিনি স্তম্ভিত, হতবাক্, ভাবলেন কেউ আমাকে ঠাট্টা করেছে, আবার ভাবলেন—সেখানে আমায় কেউ চেনে না, ঠাট্টা করার মতো কে থাকতে পারে? এটা কি? যে ভাই তিন রাত্রি আর দুদিন আমাদের সঙ্গে থেকেছে, আমোদ-আহ্লাদ করেছে, খেয়েছে, রাত কাটিয়েছে—সে কেমন করে শুক্রবার সন্ধ্যায় মারা যায়! দোঁ-মনায় পড়ে গেলেন, দু-চারজন বন্ধুদের কাছে বললেন—মনে সন্দেহ জাগল, থাকতে পারলেন না—ছুটলেন চুঁচড়োয় যেখানে তাঁর ভাই কাজ করতো কালেকটরি অফিসে। তার সহকর্মীরা তাঁকে দেখেই গভীর দুঃখের সঙ্গে জানালেন তার মৃত্যু-সংবাদ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলেরা হয়, শুক্রবার সকালে হাসপাতালে পাঠানো হয় আর সেই দিনই সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। শনিবার ছুটি থাকায় আর আপনার ঠিকানা খুঁজে না পাওয়ায় শনিবার মৃতদেহ সংকার করি—আর আজই সকালে টেলিগ্রাম করি। করুণাকাকা স্থির হয়ে শুনলেন, তাদের কাছে কিছু বললেন না—পরের ট্রেনেই ফিরে এলেন। মনে তাঁর কেবল প্রশ্ন—কেমন করে এ হলো? তার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা তো ছিল না, কেউ তো বুঝতে পারি নি—এ কি করে সম্ভব? হয়তো অধ্যাত্মবিজ্ঞান এর সমাধান করতে পারে, করুণাকাকা সমাধান করতে পারেন নি।

করুণাকাকার স্মরণে আবার তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

করুণানিধানের কবিকর্ম

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

কাব্যসংসারে দুই জাতের কবি দেখা যায়—আত্মবিস্মৃত তন্ময় কবি এবং পরিবেশ-সচেতন জাগ্রত কবি। বাস্তবের সংঘাতে আত্মবিস্মৃত কবি যে পরিবেশ সচেতন হয়ে ওঠেন না তা নয়। তেমনি পরিবেশ-সচেতন কবিও অনুভূতির নিবিড়তম মুহূর্তে তন্ময় ভাবলোকে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তার সঙ্গে পরিবেশ-সচেতনতা তাঁদের কাব্যকে সর্বযুগের কাব্যামোদীর কাছে প্রিয় করেছে। আবার আধুনিক জীবনের বাস্তবতাপীড়িত টি. এস. এলিয়ট বা ওয়াল্ট হুইটম্যানের পরিবেশ-সচেতনতা তাঁদের স্বাতন্ত্র্যধর্মী কবিকর্মকে স্বযুগের বৈষম্য-লাঞ্ছিত এবং অবক্ষয়ী মানুষের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

রবীন্দ্রযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি স্বভাবে ভাবতন্ময়তা যে পরিমানে গভীর, পরিবেশ-সচেতনতা সে পরিমানে ক্ষীণ। অকৃত্রিম অনুভূতির পরিমণ্ডলে এ আত্মবিস্মৃত তন্ময় কবি এমন একটি অপরূপ জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যে জগতে তাঁর মানস-সঞ্চরণ ছিল অত্যন্ত নির্বাধ। সে জগৎ রূপ ও রূপাতীত সৌন্দর্যের জগৎ। সৌন্দর্যানুভূতির তীব্রতা, পর্যবেক্ষণ-শক্তির তীক্ষ্ণতা, খণ্ড সৌন্দর্যকে অখণ্ড সৌন্দর্যমূর্তিতে রূপ দেবার অসামান্য প্রসাধন দক্ষতা সংহত হয়ে রূপপূজারী করুণানিধানের কবিকর্মকে এমন অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল যার আবেদন স্বযুগের রসিক কাব্যপাঠককে যে শুধু তৃপ্তি দিয়েছিল তা নয়—চিরকালীন রূপসচেতন রসিকচিত্তকে ভবিষ্যতেও বিশুদ্ধ আনন্দের অনুভূতিতে রসাভিষিক্ত করবে।

প্রত্যেক আন্তরিক কবির কাব্যপ্রেরণার উৎসে থাকে সৃষ্টিজগতের চিরন্তন প্রকৃতি, ভগবান ও মানুষের মধ্যে কোনো একটি। কবিচিত্তের প্রসারের ওপর এই তিনটি চিরন্তনী বস্তুর আনুপাতিক অনুভূতি নির্ভরশীল। কোনো কবির প্রেরণার উৎসে মুখ্যত প্রকৃতি, কারো ভগবান, আবার কোনো কবির ভাব উৎস মুখ্যত মানুষ। এমন কবিও দেখা যায় যাঁদের কবিপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ করেছে প্রকৃতি ও ভগবান। আধুনিক কালে সে পর্যায়ের কবিরই সংখ্যা গরিষ্ঠতা যাঁদের কাব্যচেতনাকে আলোড়িত ও জাগ্রত করে সৃষ্টিজগতের বিচিত্র মানুষের জীবনবোধ ও জীবনরহস্য। সার্বভৌম প্রতিভাসম্পন্ন এমন কবিও দেখা যায় যাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত কবিপ্রেরণার উৎসে প্রকৃতি, ভগবান ও মানুষের সহাবস্থান। যেমন রবীন্দ্রনাথ। আবার প্রকৃতি ও মানুষ একই সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বিহারীলালের কবি-অনুভূতিকে জাগ্রত করেছিল। একান্তভাবে মানুষের দুঃখবেদনা যে আধুনিক সহৃদয় কবি-অন্তরকে জাগ্রত করেছিল তিনি সুকান্ত

ভট্টাচার্য। কবিপ্রেরণার এই একমুখিনতা তাঁর কবি-অনুভূতিতে তীব্রতা এবং কাব্যদেহে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করলেও জীবনবোধের অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। বস্তুতপক্ষে অখণ্ড জীবনের ব্যাপকতা সীমাহীন। প্রকৃতি মানুষ ভগবান—সব কিছু নিয়েই জীবনের পূর্ণতা। এ পূর্ণতার উপলব্ধি যে কবিহৃদয়ে যত গভীর তাঁর কাব্যও সে পরিমানে কাব্যপাঠকের চিত্তে চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করে।

সুকবি করুণানিধানের কবিকর্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে উক্ত ভূমিকার প্রয়োজন, যেহেতু এ আন্তরিক কবির কাব্যপ্রেরণার উৎসেও এ অখণ্ড জীবন-বোধের অভাব ছিল। প্রকৃতি ও ভগবৎসত্তাবিধৃত অনুভূতির জগৎ তাঁর সামগ্রিক কবিচেতনার ওপর এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে স্নেহ, প্রেম অনুরাগে মৃত্যুঞ্জয়ী দোষদুর্বলতায়-কম্পিত মানবজীবনের প্রতি দৃষ্টি দেবার তাঁর বেশি অবকাশ ঘটে নি। তাঁর নিসর্গ তন্ময়তার তুলনা এ যুগে বেশি দেখা যায় নি—এটা স্বীকার্য। নিপুণ শব্দনির্বাচন, অপরূপ চিত্রকল্প ব্যবহার, বিচিত্র ছন্দলীলা অব্যর্থ মিলসৃষ্টি এবং বাণীভঙ্গির সুকুমার লীলালাবণ্যে বিকশিত হয়ে রূপরসময়ী প্রকৃতি তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে যে মনোহারিকার বেশে দেখা দিয়েছিল তার ললিতমাধুর্য এ স্থূল বাস্তবতার যুগেও আমাদের মন অনিবার্যবেগে আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রকৃতি-লালিত মানুষও যে নিরন্তর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত, আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ—স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, হিংসা, প্রতিহিংসা, কামনা-বাসনার তাড়নায় সে মন যে বিপুল বেগে নিয়ত-আবর্তিত, আলোড়িত—সে সীমাহীন জীবনরহস্যের ছায়াপোতে করুণানিধানের কাব্যতন্ত্রী বিচিত্র সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে নি। তাঁর কাব্যে মানবচেতনার অনুপস্থিতিটাই শুধু আধুনিক কাব্য-পাঠকের মনকে হতাশ করে না, যে নিসর্গ তন্ময়তা তাঁর অনুভূতিনির্ভর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সে তন্ময়তার মধ্যেও দ্বিধাবিভক্ত মনের পরিচয় পেয়ে সচেতন কাব্যপাঠক প্রবল নৈরাশ্য অনুভব করেন। করুণানিধানের কাব্যপ্রতিভা-মুগ্ধ বন্ধু কবি-সমালোচক মোহিতলাল তাঁর 'সাহিত্য বিতান' গ্রন্থে এ বিষয়ে যা মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধারযোগ্য—

'...যে সকল কবিতায় মূল-প্রেরণাই সৌন্দর্য-বিভোরতা—সেখানে সেই অবস্থাতেই এই সৌন্দর্যের পরিবর্তে 'চিরন্তন ধ্রুবে'র নিকটে আত্ম-সমর্পণের ভাব, পৌরাণিক ভক্তিভাবের ঔদাসীন্য বা আধ্যাত্মিক সত্যপিপাসার বেদনা—এই সকল কবিতার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। 'হরিদ্বার' 'হিমাদ্রি' বা 'শ্রীক্ষেত্রে'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে যতটুকু তীর্থ মাহাত্ম্য বা পৌরাণিক স্মৃতি জড়িত আছে, এই কবিতাগুলিতে সেই তীর্থ-মাহাত্ম্যই তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতিকে খর্ব করিয়াছে—প্রাকৃতিক শোভায় তন্ময় হইতে গিয়া কবিকে আত্ম-সংবরণ করিতে হইয়াছে। তাই, 'ওয়াল্‌টেয়ারে'-শীর্ষক কবিতায় যে আশ্চর্য প্রকৃতিপ্রেমের

পরিচয় পাই, তাহাতেও এই পুরাণকথার আকস্মিক অবতারণায় রসভঙ্গ হইয়াছে। কেবল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কবিতায় কবির রূপপিপাসা সকল রূপের সীমায় পৌছিতে চাহিয়াই কাঞ্চনজঙ্ঘার অলোকসম্ভব রূপজ্যোতির সম্মান রক্ষা করিয়াছে।...এই সকল কবিতায় যে আধ্যাত্মিকতার প্রয়াস আছে তাহা করুণানিধানের কবিপ্রকৃতির পক্ষে একটা কৃচ্ছ্রসাধন—ইহা তাঁহার কাব্য-প্রেরণার পরিণতি নয়, বরং এক রূপ বিপরীত গতি বলিয়াই মনে হয়।'

অকৃত্রিম প্রকৃতিপ্রেমিক কবি করুণানিধানের শক্তিমান কাব্যরচনাও যে দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার দ্বন্দ্বে কিভাবে প্রত্যাশিত সার্থকতা লাভে বঞ্চিত হয়েছে তা দেখাবার জন্য এ যুগের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক মোহিতলালের এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-উদ্ধৃতির অবতারণা। রূপ থেকে রূপাতীতের দিকে যাত্রা ভারতীয় কবিমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই। কিন্তু অরূপ জগতের অধ্যাত্মচেতনার উপলব্ধি যেখানে রূপতন্ময় কবির সৌন্দর্যরচনার জগতে অনধিকার প্রবেশ করে রসাভাস ঘটায়, সমালোচক মোহিতলালের মতো আমাদেরও সেখানেই আপত্তি।

উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও করুণানিধানের কাব্যজগৎ বিরল কবিপ্রতিভার হীরক দ্যুতিতে এত উজ্জ্বল বর্ণে আলিম্পিত যে কাব্যামোদী পাঠক নিজের অলক্ষিতে দুর্নিবার বেগে সেদিকে আকৃষ্ট হন। করুণানিধানকে কেউ কেউ মুখ্যত রূপতৃষ্ণার কবি বলে চিহ্নিত করেছেন। কবি সম্পূর্কে অভিধা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কবিজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবতন্ময় কবি রূপরসময়ী প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখেছেন, এবং সুপ্রযুক্ত কবিভাষার (Poetic diction) সাহায্যে সে সৌন্দর্যকে বাণীরূপ দিয়েছেন যা পাঠকের রসদৃষ্টিতে নিটোল মুক্তার মতো মনে হয়। অর্থাৎ করুণানিধান শুধুমাত্র আন্তরিক প্রকৃতিপ্রেমিক নন, তিনি এমন একজন নিপুণ শব্দশিল্পী যাঁর শিল্পতুলিকার স্পর্শে প্রকৃতি মনোহারিণী সজীব রূপ নিয়ে পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হন। প্রকৃতি বর্ণনায় এই সজীবতাগুণ সৃষ্টির উৎসে রয়েছে কবির 'অতি তীক্ষ্ণ এবং নিখুঁত পর্যবেক্ষণশক্তি যা স্বযুগের কবিসমাজে খুব সুলভ ছিল না'। 'শতনরী'তে করুণানিধানের সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি পড়ে মনে হয়েছে, যে অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্যকে তিনি যথার্থ রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন তার, প্রেক্ষাপটে তাঁর সহজাত প্রকৃতিপ্রেমের গভীরতা। এই তন্ময় ভাবদৃষ্টিই তাঁকে সক্ষম করেছে প্রকৃতির অত্যন্ত খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম রূপকে সজীব চিত্রের ফ্রেমে তুলে ধরতে। দ্বিতীয়ত, কবি হিসেবে তাঁর স্মরণযোগ্যতার অপর কারণ

অপরূপ কাব্যদেহনির্মাণে তাঁর সযত্ন নির্মাণ-কৌশল। বাংলা কাব্যে ইতিপূর্বেও কোনো কোনো সার্থক প্রকৃতিপ্রেমিক কবি দেখা গেছে। কিন্তু করুণানিধানের মতো এত কর্ম-সচেতন কবির সাক্ষাৎ খুব বেশি মেলে নি। নির্বাচিত তৎসম শব্দের সুপ্রয়োগে তাঁর কাব্যে সুকুমার লাবণ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে স্বভাব-গাম্ভীর্য—তাঁর কাব্যে মঞ্জীরধ্বনির সঙ্গে সমুদ্রতরঙ্গধ্বনির সহাবস্থান। তৃতীয়ত, তাঁর বিচিত্র ছন্দের দোলা পাঠকমনে জাগিয়েছে আনন্দের আলোড়ন—যে দোলায় কখনও নূপুরনিকণ আবার কখনও বা জলদনিস্বন। আধুনিক মননপ্রধান কবি বাণীকে ছন্দোবদ্ধ করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে সংকুচিত, যেহেতু ছন্দের দোলায় আধুনিক আবেগবর্জিত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। করুণানিধান প্রশ্নমনস্ক আবেগবর্জিত পাঠকের জন্য তাঁর ছন্দায়িত আবেগ-উদ্বেল কাব্য রচনা করেন নি। তাঁর কাব্য বাণীবিতানের সর্বযুগের রসিক পাঠকসমাজের জন্য যাঁদের সহৃদয় অন্তর থেকে চিরকালীন মানুষের আবেগ ও অনুভূতি এখনও বিদায় নেয় নি।

সর্বশেষে করুণানিধানের কবি-স্বভাবের অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। সে বৈশিষ্ট্য জন্মভূমি বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে কবি-অন্তরের অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়তার বন্ধন। এ অকৃত্রিম অনুভূতিই তাঁর কাব্যকে এত সজীব প্রাণস্পর্শী করেছে। এ খাঁটি বাঙালীয়ানা এবং ভারতীয় চেতনা বর্তমান আন্তর্জাতিক ভাবধারার যুগে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ মনোভাবের পরিচায়ক বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু স্বদেশপ্রীতি এবং স্বদেশের ঐতিহ্য অবগাহনের এ অকৃত্রিম প্রেরণা তাঁর সমস্ত কবিকর্মকে এমন সুগভীর প্রত্যয়জাত সত্য ও সৌন্দর্যবোধ মণ্ডিত করেছে যা আধুনিক শুষ্ক মননজাত কাব্যে সন্ধান পাওয়া সুলভ নয়।

রূপদক্ষ কবি করুণানিধান

রণজিৎকুমার সেন

রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠীর মধ্যে এক অন্যতম শক্তিমান কবি ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা পাশ কাটিয়ে চলতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও মূল সুর ও প্রকাশব্যঞ্জনায় যেমন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম ক'রে উঠতে পারেন নি, তেমনি পারেন নি সত্যেন্দ্রনাথ মোহিতলাল যতীন্দ্রমোহন কুমুদরঞ্জন কালিদাস নজরুল বা করুণানিধান। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি ও রোমান্টিক ভাবাবেগ যেমন অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে অতীন্দ্রিয়বাদ। একসময় ইংরেজি ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের প্রাধান্য কাটিয়ে এদেশের কবিকুল রোমান্টিসিজ্‌মের ভক্ত হয়ে ওঠেন; তার অভিনব সার্থক প্রকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথে। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে তার রূপকল্প ধরা পড়তে বিলম্ব হয় না। করুণানিধানেও তার প্রকাশ অব্যাহত দেখা যায়। প্রকৃতি ও প্রেম তাঁর কাব্যে একাত্ম হয়ে দেখা দেবার ফলে একদা পাঠকসমাজ একান্ত সহজেই তাঁর কাব্যকে সাদরে গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এই ঈশ্বরনির্ভর ও প্রকৃতিপ্রেমী রোমান্টিক কাব্যধারা যখন বাংলা সাহিত্যে একটি স্থির পরিণতিতে এসে পৌঁছায়, তখনই এদেশে দেখা দেয় নতুন কাব্যান্দোলন—যার সুরটি অনেকাংশে পশ্চিমী হয়েও আমাদের সামাজিক অগ্রগতি ও প্রগতিশীল ভাবধারার পক্ষে প্রয়োজনবোধেই খাপ খেয়ে গেল। এখানে বিপুল প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ অম্লান হয়ে বিরাজ করলেও রবীন্দ্রানুসারী কবিরা যথেষ্ট দীপ্তির সঙ্গে ভাস্বর হয়ে রইলেন না—যতটা রইলেন সদ্য-বিগত যুগের কবি হিসেবে আলোচনার বিষয়ভূত হয়ে। করুণানিধান তাঁদেরই অন্যতম একজন।

অথচ তাঁর কালে স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই থেকে শুরু করে প্রেমবিলাসী ও কাব্যপিপাসু পাঠকের হৃদয়ে তিনি যে কত বেশি উজ্জ্বল ছিলেন, তা আজকের এই বিতর্কিত বালিয়ারিতে ব'সে কল্পনা করা দুঃসাধ্য। তিনি রবীন্দ্রানুসারী কবি হলেও রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিসিজ্‌ম বা সিম্বোলিজ্‌ম তাঁর কাব্যে ছায়াপাত করার অবকাশ পায় নি, বরং রাবীন্দ্রিক রোমান্টিসিজ্‌মের অনুগামী হয়ে তাঁর কবিতা ক্রমে তাঁর নিজস্ব ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তিপ্রবণ মনটি ধীরে ধীরে ডিভোশনাল লিরিক্সের দিকে এগিয়েছে। যেমন—

> 'কর্মে তাঁরে করিলে প্রীত হবে গো তার প্রিয়,
> যা কিছু কর ফলের সনে তাঁরেই সমর্পিও;
> ভালো হলেই বাসেন ভালো,

দেখান খেয়া-তরীর আলো,
একান্তে গো তাঁরেই ডেকো, তিনিই রমনীয়।'

তাঁর ঈশ্বরনির্ভর মন ঈশ্বরকে যে ভাবে আপন খেয়ানে ধরতে চাইতো, সেই ভাবেই কাব্যের নীতিমাল্য রচনা ক'রে তিনি তাঁর পাঠককে উপহার দিয়েছেন, যেমন—

'যাঁর প্রকাশে সব প্রকাশে, বিশ্ব যাঁহার কাব্য,
ইচ্ছাতে যাঁর সম্ভবপর সকল অসম্ভাব্য,
যাঁহা হতে সূর্য ওঠেন, যাঁহাতে যান অস্ত,
তিনিই আমি, তিনিই তুমি, তিনিই তো সমস্ত।
...
তিনিই গড়েন রক্ষা করেন নাশেন তাঁহার সৃষ্টি,
ক্বচিৎ কারেও দেন গো দেখা করেন কৃপাদৃষ্টি।'

সহজ কথা সরলভাবে বলা বড় সহজ নয়, বিশেষতঃ যে-নবকাব্য-আন্দোলনে সাম্প্রতিক কালের কবিগোষ্ঠী সদ্য-বিগত কালের কবিসমাজকে বাংলাসাহিত্যের আঙিনায় প্রায় বর্জন করেছেন, সেই কবিগোষ্ঠির হাতে কাব্য কি ধ্বনিমাধুর্যে, কি অলঙ্কারে, কি শব্দচয়নে আদৌ সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠতে পারে নি। অথচ সহজ কথা সরলভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে যে মাধুর্য—তা করুণানিধানের কাব্যে আমরা অধিকমাত্রায় খুঁজে পাই। তাঁর শব্দচয়ন বা প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কোথাও কষ্টকল্পনা নেই, কোথাও জড়তা নেই, কোথাও দুর্বোধ্যতা নেই, বরং এক পরম নৈপুণ্যে ও গতিময় ছন্দে তাঁর কাব্যপ্রকৃতি নিসর্গ ও মানবিক প্রেমকে লাবণ্যময় করে তুলেছে। মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায়—করুণানিধান সাক্ষাৎ রবীন্দ্রশিষ্যগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কবি বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভক্ত করুণানিধানের কবিতায় ভাষার লাবণ্য শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ চিত্রিত করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া তিনি যেমন নিছক সৌন্দর্যপ্রীতির কবি, তেমনি ছন্দের অনুযায়ী ভাষা ও ভাবের অনুযায়ী শব্দসঙ্গীত রচনাতেও তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং ভাষায় ললিত মধুর ও উদার গম্ভীর—দুই সুরেরই সাধনা করিয়াছেন। তথাপি করুণানিধান বাংলা গীতিকাব্যে যে একটি নূতন ধরণের প্রকৃতিপ্রেম যুক্ত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা ও কবিত্বের প্রধান নিদর্শন। যেমন এক অদ্ভুত স্বপ্নিল ও গীতিময় চিত্র আঁকতে গিয়ে 'স্বপ্নলোকে' কবিতায় কবি বলেছেন—

'তাদের চুলের ফুলের বাসে গন্ধ হারায় গোলাপ বেলা।
কে অপ্সরী সারেঙ বাজায়, কি অপরূপ সুরের খেলা!

নিদাঘ-রাতে রাখাল-ছেলে চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের গুঞ্জরিছে গিরির কোলে।'

এরই পাশাপাশি আর-একটি চিত্র—

'প্রভাতে গিরির শিরে দেখ দেখ কে গিয়েছে ফেলি—
কি সুন্দর!—যেন সে ময়ূরকণ্ঠি কুয়াশার চেলী।'

ভাষার এই লাবণ্য এবং শব্দচয়নের এই নৈপুণ্যের তুলনা নেই। এ রকম রূপতন্ময় দৃশ্যচিত্রের অভাব নেই করুণানিধানের কাব্যে। যেমন 'তন্দ্রাপথে'র দুটি পংক্তি—

'উড়ো পাখির সুরের সুরায় সরল-তরুর আব্‌ছায়ে
প্রবাল-বরণ-বৈকালে আজ কোন্ পাষাণী গান গাহে।'

তাঁর তীর্থ পরিক্রমা-কাব্যের নানা পংক্তি জুড়েও কত না অনুপ্রাসে ও ভাবের ললিত বিভাসে এমনি রূপকল্প নানা দৃশ্য ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে! এখানে রোমান্টিসিজ্‌মের সঙ্গে ক্ল্যাসিসিজ্‌ম যেন একাত্ম রূপ পেয়ে আমাদের অন্তরে সেই রূপতন্ময়তায় তরঙ্গ সৃষ্টি করে যায়। যেমন তাঁর বিখ্যাত 'রেবা' কবিতাটির দুটি রূপদক্ষ পংক্তি—

'আবর্ত-শোভন-নাভি অলঙ্কৃত কটিতট হংস-মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে যৌবন-বিভায়?'

ক্রমে তিনি রূপ থেকে অরূপে গিয়ে পৌছেচেন। তিনি যে কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন, তা যেমন বার বার আমাদের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি সমসাময়িক বস্তুলোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তিনি যে অতীতের স্বপ্নরঙিন দৃশ্য ও প্রকৃতির গহন শ্যামল শোভা এঁকে ধীরে ধীরে রূপাতীত জগতের অধ্যাত্ম স্বাদে মনকে ডুবিয়ে দেবার প্রয়াসী হয়েছেন, তাও বার বার আমাদের মনে সুফী ও বাউলরীতিকে মনে পড়িয়ে দেয়। এখানে এসে কবির চিত্তে আর রূপতরঙ্গ দোলা দেয় না, দোলা দেয় এক অদ্ভুত শান্ত নূপুরসিঞ্জন—যা শ্রীরাধিকাকে একদা কৃষ্ণগত করেছিল। এই অরূপ-দর্শনই কবি করুণানিধানের জীবনের শেষ পরিণতি।

১৮৭৭ সালের ১৯শে নভেম্বর তাঁর জন্ম। পিতা নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আদি নিবাস হুগলীর গুপ্তিপাড়া হলেও প্রধানতঃ তাঁরা ছিলেন শান্তিপুরের মানুষ। বি. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য না হয়ে করুণানিধানের ছাত্রজীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৯০২ সালে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমজীবনে কিছুকাল তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করে পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যিকমণ্ডলী কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে এক হাজার টাকা দক্ষিণা সহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবির ৭৩ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে দক্ষিণাসহ

সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। শেষজীবনে আমৃত্যু তিনি 'সাহিত্যতীর্থ' সংস্থার তীর্থপতিপদ অলঙ্কৃত ক'রে গিয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ, যথা—বঙ্গমঙ্গল (১৩০৮), প্রসাদী (১৩১১), ঝরাফুল (১৩১৮), শান্তিজল (১৩২০), ধানদূর্বা (১৩২৮), শতনরী (১৩৩৭)—কবি হেমচন্দ্র বাগচী সঙ্কলিত ও ১৩৫৫—কবিশেখর কালিদাস রায় সঙ্কলিত (তিন বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. অনার্স পাঠ্য হয়), রবীন্দ্র-আরতি (১৩৪৪), গীতায়ন (খসড়া ১৩৫৬). গীতারঞ্জন (গীতায়নের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ১৩৫৮) এবং ত্রয়ী (বঙ্গমঙ্গল, প্রসাদী ও ঝরফুলের একত্র সঙ্কলন ১৩৬০)।

করুণানিধানের জীবন আদৌ ঘটনাবহুল ছিল না। আজীবন তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর জীবনের অনেকাংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬এ এবং করুণানিধানের ১৮ ৭ এ। বাংলায় প্রাণের নিকেতনে একজন সর্বজনসমাদৃত কথাশিল্পী, আর একজন সর্বজনপ্রিয় কবি। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল মূলতঃ বাংলার মানস-প্রকৃতি। সমসাময়িক কোনো কবি-সমালোচকের কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়—সমস্ত জীবন তিনি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছেন, তবু জীবনের সবকিছু ঝড়ঝঞ্ঝা নিরাশা-দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে প্রকৃতিকে এক নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছিলেন।...তাঁর কাব্যে বিশ্ব-মানবতার বাণী নেই, মহান জীবনদর্শন নেই, মহৎ বিশ্বতত্ত্ব নেই—ঘরের কথা, ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথা অকৃত্রিম সরল ভাষায় তিনি বিবৃত করেছেন। সেই বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ফুটেছে তাঁর সুস্থ কল্পনা ও স্বচ্ছ মমতার নিবিড় স্পর্শ। বঙ্গপল্লীর ছায়াস্নিগ্ধ আম্রকানন, কুমুদখচিত বিল, ডাহুক-ডাকা দীঘি এবং এই শান্ত পরিবেশের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত নানা উৎসব-অনুষ্ঠান তাঁর রচনায় যেভাবে মূর্ত হয়েছে, চমৎকারিত্বের দিক দিয়ে তা অতুলনীয়।'

জীবনে তিনি যেমন রূপ থেকে রূপাতীতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, তেমনি বসুন্ধরার মোহবন্ধ থেকে ছুটির প্রত্যাশায় চেয়েছিলেন শেষ উত্তরণ।—

'ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা, প্রণমে মন,
পেয়েছি তোমার বিন্দুতে মধু নির্ঝরণ।
মৃত্যু হাসিয়া প্রসাদ বিতরে,
কাঁপে থর থর বুকের ভিতরে,
বাই গো তরণী, কোন্ কূলে শেষ উত্তরণ?'

জীবনের এ-কূল থেকে তিনি ও-কূলে পাড়ি দিয়ে গেলেন ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী। জীবনের চির-প্রত্যাশিত শেষ উত্তরণ।

প্রকৃতির কবি করুণানিধান

সন্তোষকুমার অধিকারী

দৈব যদি রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা পূর্ণ করতো এবং একালের কোনো কবি জন্ম নিতেন কালিদাসের কালে, তা হলে কি ঘট্‌তে পারতো তা অনুমান করা শক্ত। কিন্তু কালিদাস যদি দৈবের খেয়ালে এ যুগে জন্ম নিতেন তবে সেই অমর কাব্য মেঘদূত বা অভিজ্ঞানশকুন্তলম যে আর একবার করে লিখতে বসতেন না— এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ কাব্যশক্তিই সব নয়, কাব্যের উপকরণ এবং পরিবেশের ওপর সার্থক রচনায় অনেকটাই নির্ভর করে। কালিদাসের কাল থেকে আমরা যেমন দূরে সরে এসেছি, রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম এমন কি দ্বিতীয় পর্যায় থেকেও তাই। আকাশ এখনও নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হয়ে ওঠে, 'ঘন গর্জনে নীল অরণ্য'ও শিহরিত হয়, কিন্তু নিসর্গ শোভার এই বিচিত্র সমারোহ এ যুগের কোনো কবির মনে সেই আবেগ জাগায় না। কারণ এ যুগের পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মানুষের জীবনের ধারা সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তার জীবনাদর্শ যেমন বদ্‌লে যাচ্ছে, জীবন সম্পর্কে তার মূল্যবোধ যেমন শিথিল হয়ে যাচ্ছে, তেমনি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার চোখ, সৌন্দর্যের রূপ ও রসের স্বপ্ন। প্রথম মহাযুদ্ধই মানুষের চোখে সভ্যতার বীভৎসতাকে নগ্ন করে তুলে ধরে ছিল; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেছে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের ধারণা। জীবন এখন যেমন জটিল তেমনি জান্তব। যেমন যন্ত্রণাকর তেমনি নৈরাশ্যদায়ক।

আধুনিক আমেরিকান কবির চোখে তাই রবীন্দ্রনাথ has become outdated to-day. আজকের এই পরিবেশকে সুস্থ কাব্যবিচারের প্রতিকূল বলেই আমার মনে হয়। কবি করুণানিধানের কাব্যসুষমা কেউ উপভোগ করতে না পারলে আমি দুঃখিত বা বিস্মিত হব না। এই বিবর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণমণ্ডিত কাব্যপরিমণ্ডলের দিকে চোখ ফেরালে আমরাই বিস্মিত হয়ে ভাববো যে, আশায় উজ্জ্বল নিছক রোমান্টিক কাব্যভাবনায় এমন একটি যুগও একসময়ে বর্তমান ছিল।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যালোচনা নিশ্চয়ই আজ সঠিক মূল্যে সম্ভব নয়। কারণ আমাদের মূল্যবোধের নিরিখ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কারণ করুণানিধান কিম্বা কুমুদরঞ্জন মল্লিক যে সৌন্দর্যবোধ চোখে নিয়ে, যে আকুল প্রকৃতি প্রেম বুকে নিয়ে তাঁদের আজীবন সাধনায় মগ্ন ছিলেন, সে সৌন্দর্যের ছবিও যেমন আমাদের নেই, সেই অনুভবও ত আমাদের হৃদয়ে নেই।

সেদিনের কাব্যপরিমণ্ডলের সামিয়ানা খাটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে।

তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যদিকে তেমনি করুণানিধান। ছিলেন যতীন বাগচী কুমুদরঞ্জন কালিদাস রায়—যাঁরা সকলেই মূলতঃ রোমান্টিক চিন্তান্বিত লিরিক কবি; যাঁদের সকলেরই কাব্যানুধ্যান ছিল প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসনায়।

প্রকৃতি ও প্রেমের কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালী কাব্যে নয়, বিশ্বকাব্যজগতে অনন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমে এবং মানবীপ্রেমের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় অনুভব তাঁকে সর্বকালের মানসে উত্তীর্ণ করে রেখেছে, তার তুলনা অন্যের মধ্যে বিরল। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সীমার পরিধিতে—প্রকৃতির রূপে বিভোর হয়ে যিনি সমস্ত জীবনটাই বন্দনাগান করেছেন সেই নিসর্গ সৌন্দর্যের সেই কবিই হলেন করুণানিধান।

রবীন্দ্রযুগের এবং রবীন্দ্রপ্রভাবে প্রভাবিত কবিসমাজের মধ্যে করুণানিধানকে কবি হিসাবে বিশিষ্টতম বলে আমার মনে হয়েছে নানা কারণে।

করুণানিধানকে 'প্রকৃতির কবি' বলে যতখানি বর্ণনা করা যায়, এতখানি অসংশয়ে আর কারুকে বলা যায় না। রূপতন্ময়তা তাঁর স্বভাব। সৌন্দর্য তাঁর সাধনা। কোনো অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে উত্তরণের প্রয়াস বা আগ্রহ তাঁর নেই দর্শনের জটিলতা রূপসাগরে ডুব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে আবিল করে নি। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম একনিষ্ঠ, সরল এবং ভক্তের প্রেম।

বলা যায় সারল্য এবং বস্তুনিষ্ঠাই তাঁর কবিতাগুলিকে রূপের রসলোকে উত্তীর্ণ করিয়েছে। সেই আকাশ মেঘ বর্ষা নদী প্রান্তর বন, সেই শিউলি মাধবী এবং কেতকীই তাঁর রূপলোকের পরিধি জুড়ে ছড়িয়ে আছে। যা সুন্দর এবং স্বাভাবিক তা চিরকালের। সেই চিরকালের বাংলাপ্রকৃতির রূপ দুচোখ ভরে দেখে তার ধ্যানে এমনভাবে মগ্ন হতে আর কাউকে দেখি নি। পদ্মপুকুরের রূপে তিনি যেমন মুগ্ধ হয়ে গান বাঁধেন—

'মেঘের ছায়া-ঢাকা, সজল কেয়াঝাড়, পদ্মপুকুরের সবুজ ঢালু পাড়,
তরুণ তরুলতা বাতাসে কহে কথা— আমারি নাহি গাথা ভুবন ভুলাবার।
কে যাচে সুধামাখা ফটিক জল— তৃষা কি পূরিবে না বল্ রে বল্।'

তেমনি বসন্ত সমাগমে 'বনপথে'র স্পর্শগন্ধময় সৌন্দর্য তাঁকে উজ্জ্বল করে দেয়। তিনি লেখেন—

'নাগকেশরের গন্ধে পাগল সান্ধ্য ফাগুন হাওয়া,
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার? কোন্ সুরে যায় গাওয়া?'

ঋতুবৈচিত্র্য বাংলাদেশের প্রকৃতিকে যে মহিমময়তা দান করেছে এমনটা বোধ হয় আর কোনো দেশে হয় নি। কখনো পুষ্পিত বনপথের সন্ধ্যারাগে উত্তাল বসন্ত ঋতুর সমারোহ আবার কখনো অঝোর বর্ষাধারায় সিক্ত মেঘনিবিড় শ্রাবণের রাত্রে বর্ষার আবির্ভাব। 'ঘন গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে'—রবীন্দ্রনাথ

বর্ষাকে অমর করেছেন বাংলা কাব্যসাহিত্যে। এই বর্ষায় বাংলাপ্রকৃতিকে তার সরল সৌন্দর্যে এঁকেছেন করুণানিধান—

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল— আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল— বড় দুরন্ত মেয়ে।

এ মেয়ে বাংলাদেশের। এ বর্ণনাতে আমরা আমাদের বড়চেনা বাংলার গ্রামের রূপই প্রত্যক্ষ করি—

যূথীমালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি, মুকুতার পাঁতি যায় গড়াগড়ি,
ধূলাকাদা মাখা পার্পাড়িতে ঢাকা কামিনী তরুর তলা।
দূর নির্জনে তমালের ডালে শ্যামলা মালতী সুধাধারা ঢালে,
বন তমালের কানে কানে তার কি কথা হ'ল না বলা।

করুণানিধানের বৈশিষ্ট্য তিনি শুধু প্রকৃতির কবি নন, তিনি বাঙালীর কবি। কাব্যের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের ছবি তিনি যেমনভাবে এঁকেছেন, এমনটা বড় পাওয়া যায় না। এত আন্তরিক পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালে শুধু জীবনানন্দের মাঝেই দেখা গিয়েছিল।

কবির মধ্যে প্রেমের আবেগ ছিল তাঁর স্বভাব সারল্যে দীপ্ত এবং মধুর। তাঁর অগ্রজ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মুখ্যতঃ প্রেমের কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে ইন্দ্রিয়জ-অনুভবের চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। করুণানিধানের প্রেম মুগ্ধপ্রেমিকের স্বার্থশূন্য রূপারতি। সে আরতিতে রমণীরূপ ও প্রকৃতি যেন একই আধারে মিশে গেছে।

আজও ফোটে তেমনি শোভায় বনগোলাপের লাল কুঁড়ি—
নিথর হয়ে প্রজাপতি বসে গো তার বুক জুড়ি।
বাঁধের ঘাটে পূর্ণিমা সে চুপি চুপি নাইতে আসে,
শুয়ে উঠি শুনি যখন বাজে তরল জল চুড়ি।

একি প্রকৃতি বন্দনা না নারীস্তুতি? মনে হয়, বন্ধু মোহিতলালের দেহবাদ তাঁকে স্পর্শও করে নি। তাঁর মনে ভোগের আকাঙক্ষা কোনোদিন বড় হয়ে ওঠে নি। জীবনে দুঃখ বেদনা তিনি পেয়েছেন কিন্তু সে বেদনা তাঁকে যেমন বিমুখ করে নি, চরম দারিদ্র্যও তেমনি তাঁর মনে ব্যর্থতার বোধ জাগায় নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ঋতুবদল ঘটেছে, কিন্তু সে পরিবর্তন তাঁর মনকে আবিল করে নি। সময় সচেতন বা সমাজমুখী নন বলে তাঁকে অপবাদ যাঁরা দেবেন, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, বাণীর কমলবনে তিনি ছিলেন শুধু রূপমুগ্ধ এক পূজারী।

তিনি ছিলেন পুরোপুরি বাঙালী। বাংলার মাটি; বাংলার জল, বাংলার মাঠ বন নদী, বাংলার ফুল, বাংলার ঋতু, বাংলার আকাশ জড়িয়েছিল তাঁর চোখে। সেই বাংলাকে বুকে রেখেই কবি করুণানিধান তাঁর জীবন সমাপ্ত করেছেন।

স্বদেশের কবি করুণানিধান

স্থধীরকুমার মিত্র

একশো বছর আগে সাহিত্যরসিক বাঙালী পাঠকমহলে সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথের পঞ্চশিষ্যের অন্যতম করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ সালের ১৯ নভেম্বর শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া ছিল তাঁর পৈত্রিক নিবাস। আর গঙ্গার পরপারে শান্তিপুর ছিল তাঁর মাতুলালয়। এই দুই স্থানই সেকালে সংস্কৃত শিক্ষার ছিল প্রধান কেন্দ্র। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীকাব্যে এই ঐতিহাসিক স্থানদ্বয়ের বিষয়ে লিখেছেন—

'বহে বহে বন্যা ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া—বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া।' করুণানিধানের পিতার নাম নৃসিংহনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী। তাঁর মাতুল রামনাথ তর্করত্নের তৎকালে পণ্ডিত হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ছিল। করুণানিধান ছিলেন বঙ্গসাহিত্যে রূপের কবি, রসের কবি, স্বপ্নের কবি হিসাবে প্রখ্যাত।

বাংল কাব্যসাহিত্যে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে শিষ্যবর্গ ভাষা-জননীর আরতি করেছিলেন, করুণানিধান ছিলেন তার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ শিষ্য হলেও করুণানিধানের রচনার ধারা ছিল রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর শিষ্যগণের চেয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। স্বভাবকবি করুণানিধানের সহজাত কবিত্বশক্তি রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচনার দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হলেও, তিনি কখনও তাঁর অনুসরণ করেন নি, এটাই ছিল কবি করুণানিধানের বিশেষত্ব।

তরুণ বয়স থেকেই করুণানিধান ছিলেন কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং ছাত্রাবস্থায় ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনায় ২৪ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। নিগ্রহের আশঙ্কায় বঙ্গমঙ্গলের প্রথম সংস্করণে কবির নাম ছিল না। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রসাদী' প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে এবং এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর কাব্যরচনায় করুণানিধানের স্বভাবদত্ত ক্ষমতার নিখুঁত ছবি সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঙালী জাতিকে স্বদেশবাৎসল্য ও স্বধর্মপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বন্দনীয় কবি রঙ্গলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মতো করুণানিধানও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য বাঙালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বাঙালী পাঠক পুরাতন যুগকে মমতার চোখে দেখেন না, তাই আজ এঁরা সব বিলীন হতে চলেছেন। এ দুঃখ যে কেবল বর্তমান যুগের তা নয়, এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্বভাবের দোষের মধ্যে অন্যতম।

পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় ১২৬৫ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুরের কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁকে আক্ষেপ করে চার লাইনের একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেই আক্ষেপোক্তিটি তাঁর পুস্তকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। সেটি আজও বাঙালী পাঠকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে উল্লেখনীয়। কবিতাটি হচ্ছে—

আধুনিক যুবাজনে স্বদেশীয় কবিগান,
ঘৃণা করে নাহি দহে প্রাণে।
বাঙালীর মন-পদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম,
এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে॥

কবি করুণানিধানের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কবিশেখর কালিদাস রায়। তাঁরা সকলেই করুণানিধানের কবিতাবলী থেকে যে আনন্দধারা ও অভিনব রসপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, তা তাঁদের গ্রন্থে অকপটে তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্নিবদ্ধ করেছেন। করুণানিধানের 'শতনরী' কাব্যের ভূমিকায় ১৩৩৭ সালে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন—

'করুণানিধানের রচনার টেক্‌নিক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের রচনা হইতে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথের রচনার sequence ছিল প্রধানত rhetorical, যতীন্দ্রমোহন ও কুমুদরঞ্জনের রচনার sequence—emotional, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনায় sequence প্রধানতঃ logical. করুণানিধানের রচনার sequence এই গুলির কোনোটি নহে, এই sequence এর ইংরাজি নাম দিতে পারিলাম না। ইহা স্বপ্নাবেশের sequence। কবি বর্ষাচিত্রে এই বিশ্বকে দেখিয়াছেন বৃষ্টিজলের চিকের মধ্য দিয়া। আমরা বলি, তিনি সমগ্র সৃষ্টিকেই দেখিয়াছেন—স্বপ্নজালের চিকের মধ্য দিয়া। এই দৃষ্টির ফলে সমগ্র সৃষ্টিই কবির কাব্যে অভিনব রহস্যময় রূপ লাভ করিয়াছে। সৃষ্টির এই স্বপ্ন-রহস্যময় রূপই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। করুণানিধান এই রূপমুগ্ধতায় ধ্যানযোগী। করুণানিধানের রূপমুগ্ধ হইবার শক্তি অগাধ। কবির কাব্যে ধ্বনির সহিত রূপের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে।

করুণানিধানকে বলা হয় রোম্যাণ্টিক বা রসময় কবি। তিনি কবিতাকে কেবল বাস্তব বা জড়জগতের প্রতিচ্ছবি বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে কবিতা হচ্ছে ত্রি-তাপ দগ্ধ জীবের শান্তির স্থান। এই রসাদর্শ তাঁর কবিতার সর্বত্র সহজ সৌন্দর্যে সরলতায় শুচিতায় মাধুর্যমণ্ডিত করেছে বলে তাঁর কবিতা পাঠককে একটি অন্য রাজ্যে যেন নিয়ে যায়। কবিশেখরের ভাষায়—'কবি যৌবনে তাহার কাব্যজীবনে যে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সে লোকে দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, পাপ নাই, মালিন্য নাই, জৈবজীবনের কোনো চাহিদার

কথা নাই জরামরণও নাই। তাঁহার নিজের জীবনের শত দুঃখ দৈন্য, অভাব অভিযোগ কিছুই সে লোকে স্থান পায় নাই। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষে যে কুটস্থতা বা detachment প্রধান ধর্ম, তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। করুণানিধান কবিতাকে বাস্তবজীবনের অভিব্যক্তি বা বাস্তবজগতের চিত্রমাত্র মনে করিতেন না—তিনি মনে করিতেন—এই কাব্যলোক ত্বরাতপ্ত, জরাগ্রস্ত, আধিব্যধিময়, দুঃখক্লেশে ভরা বাস্তবজগত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার আশ্রয়—সমস্ত তাপজ্বালা ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভের আশ্রম।...আধি-জীবনের কবি তিনি নহেন, অধি-জীবনের কবি তিনি। আমাদের এই বাস্তবতার উপরে যে একটা সর্বমালিন্যশূন্য আনন্দময় জীবন আছে, করুণানিধান তাহারই কবি।'

করুণানিধানের কাব্যে প্রেমের স্বপ্নসুন্দর রূপ, প্রকৃতির বর্ণগন্ধময় লাবণ্য ও অধ্যাত্মসাধনার ব্যাকুলতা সহজ ভাষায় ও সরল সুন্দর সুললিত ছন্দে বিবৃত হয়েছে। ঘরে রসমাধুরী পাঠকের কখনও ক্লান্তি আনে না বরং পরিদৃশ্যমান জগতের সব কিছুই তখন মনে হয় যেন মাধুর্যময়।

এই না জীবন—মানব জীবন! ফুল-ফোটা ফুল ঝরা!
সুমুখে হাস্য, পিছনে অশ্রু, শয্যা-শায়িনী জরা!—
হেরিনু চমকি আসে নর-নারী,
মাঝে তার এক বঙ্গ-কুমারী,
বুকে দোলে হার, আঁখি দুটি তার, দুখ-নবনীতে ভরা।

কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—ঝরাফুল (১৩২৮) শতনরী (১৩৩১) আরতি (১৩৪৪) গীতায়ন (১৩৫৬) গীতারঞ্জন (১৩৫৮) ও অপ্রকাশিত শেষ পসরা, চিত্রায়নী প্রভৃতি একত্রে গ্রথিত করে বর্তমান বর্ষে প্রকাশিত হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথের গহন গভীর মধুর কাব্যরাজি আমাদের মনকে এমন ভাবে আবিষ্ট করেছে যে করুণানিধানের কাব্যসংগ্রহ করতে না পারার জন্য তাঁকেও আমরা বিস্মৃত হতে চলেছি। কাশীরাম দাসের মতন করুণানিধান 'নিঙাড়িয়া ভাষা ছন্দে' যে মনোহর কাব্য সৃষ্টি করেছেন, তা মহাভারতের মতো অমৃতলহরী 'শুনিলে অধর্ম ক্ষয় পরলোকে তরি' এ কথা বলতে আমার সংশয় নেই।

কবি করুণানিধান ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব, তাই 'নবদ্বীপ' কবিতায় 'নামের স্মরণ-মাত্রে হরে তাপ-ত্রয়—চণ্ডালও যে তৎক্ষণাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়।' এ কথা বলা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আট পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ কবিতার প্রথম স্তবকের ছ'লাইন হচ্ছে—

চৈতন্য-উদয়-তীর্থ নবদ্বীপধাম
লহ এই পুণ্য-লোভী যাত্রীর প্রণাম।

ব্রজ-রজঃতুল্য এই পুত-করা ধূলি
প্রাণ যে মাগিছে ভিখ্, লৈনু শিরে তুলি।
এই গঙ্গা-জলাঙ্গীর যুক্ত-বেণী-তটে
পাবনেরও পাবন, হরির নাম রটে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য—অন্য উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ মহাপাপ' বলেছেন, কবি এই চরম কথাটি আদর্শ করে নিজের জীবনে পালন করে গেছেন।

কবি হৃষিকেশ চিত্রকূট হরিদ্বার বৃন্দাবন বৈদ্যনাথ শ্রীক্ষেত্র সীমাচলম প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে যে সব কাব্য রচনা করেছেন তা পড়লে ভক্তহৃদয় আনন্দে ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়ে যায়। এই সব তীর্থ দর্শনের পর তাঁর মন্তব্যটিও অতি চমৎকার, একটি সত্যভাষণ। যথা—

কলির তন্ত্রে চলিতেছে ঘোর অধর্ম অনাচার
ঠাকুর-পূজার বেদীর উপর বসেছে অহঙ্কার।
নূতন করিয়া গড়িতে নিয়তি জ্বালিনু বিরজা হোম,
নমো গোবিন্দ, পূর্ণানন্দ, ওম প্রশান্তি ওম।

এ ছাড়া চণ্ডীদাস জয়দেব থেকে সুরু করে বঙ্গের বরেণ্য সন্তান কৃত্তিবাস রামমোহন মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র রামেন্দ্রসুন্দর আশুতোষ দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিজেন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ দেশবন্ধু রবীন্দ্রনাথ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতির বিষয়ে যে সব প্রশস্তি তিনি রচনা করেছেন তা বঙ্গসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। 'যে লোকে দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, পাপ নাই মালিন্য নাই, জরামরণ নাই, জৈবজীবনের কোনো চাহিদার কথা নাই' সেই রকম কয়েকটি কবিতার রসাস্বাদন অনুরক্ত পাঠকদের করাতে পারলে আমার আনন্দ হ'ত, কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাঁর জন্মস্থান 'শান্তিপুর' নামক কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন উৎকলন করে, যাঁকে একাধিক বার দর্শনের আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁর উদ্দেশে তাঁর শতবর্ষের জয়ন্তীতে জানাই আমার কোটি প্রণাম।

তোর মাটি মা, দিব্য মাটি—অদ্বৈতের তপঃস্থল,
'ধূলোট্' ধুলায় উঠ্‌ল রে নাম-গান,
এই মাটিতে পড়্‌ল ঝ'রে সোনার গোরার অশ্রুজল
ছাপিয়ে 'নদে' এলো প্রেমের বান।
এইখানে মা, এই শ্রীপাঠে, হরিনামের মন্তরে
ত'রে গেল যবন-হরিদাস,
চল্‌ল না যে জল্লাদেরি রক্তরাঙা খর্পরে—
মরণাকে করলে পরিহাস।

কবি করুণানিধান স্মরণে

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যতীর্থ শুধু কি একটি তথাকথিত সাহিত্যমোদীদের পোশাকী প্রতিষ্ঠানের নাম যা একান্ত ব্যক্তিগত ভাবস্থিরতার রসময়তার সঞ্চয় খুঁজেছে পাঁচজনের মধ্যে, বিতরণ করেছে সেই তার সদস্যদের মধ্যে সেই ভাব ঐশ্বর্যের প্রবাহে—আমি বলবো না অবশ্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিগদর্শনে সেই মত যাচাই করে নিয়ে। সাহিত্য বলতে বোঝায় সহিতত্ব, সকলের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ আর তীর্থ হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে মাথা আপনি নত হয়, বিষ্ণু পাদোদ্ভূতা জাহ্নবী বারির মতো দ্রবীভূত হয়, চিত্ত বিত্তবান বেগবান বীর্যবান হয়, অন্তরের দেবতা অনুভূতির রাজ্যে পরিস্ফুট হন, ব্যক্ত হন, বাঙ্ময় হন—মৃন্ময় মনে আরোপিত হয় সেই চিন্ময় সত্তা, যা মানুষকে বুঝিয়ে দেয়, জানিয়ে দেয়, রাঙিয়ে দেয়, রসিয়ে দেয়, নবনবোন্মেষশালিনী ঐশ্বর্যের ও বৈভবের সামনাসামনি করে দেয় কল্পনায় চিন্তায় চেতনায়। এই ধরণের কাজই হচ্ছে সাহিত্য প্রবেশের দ্বার, তবেই সাহিত্যতীর্থ গঠন করা যায়, তা না হলে হয় ডিবেটিং সোসাইটি বা মামুলী প্রবন্ধ বা গল্প পড়বার একটা আশ্রয় স্থল। আশ্রয় যদি আশ্রম না হলো তবে সাহিত্যের প্রথম পাঠই নেওয়া হলো না। করুণানিধান শুধু ছিলেন কবি নন কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, শেষের দিকে তিনি সাধক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। ঋষি, সত্যের দ্রষ্টা, কবি, সুন্দরের স্রষ্টা আর নবী, মঙ্গলের হোতা বলেছেন শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়। সত্য সুন্দর আর শিব একত্র না হলে তীর্থ হয় না। আমাদের সাহিত্যতীর্থের সীমানা সেইখানে এবং তাঁর প্রথম অধিনায়ক যে করুণানিধান হয়েছিলেন এটা শুধু রুচিসঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত নয়—তীর্থপতি হবার উপযুক্ত আধার ছিলেন তিনি। আজ তাঁর শতবার্ষিকী বৎসরে তাঁকে প্রণাম জানাই। মনে পড়ছে তাঁরই 'হৃষীকেশে' কবিতা—

> নমো সহস্র-শীর্ষ পুরুষ, সর্ববিভূতিমান্
> ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রের ধ্যেয়, অচিন্ত্য ভগবান্।
> চিরপুরাতন, নিত্য-নূতন, তুমি বর্ধন-ক্ষয়
> চিরসুন্দর, ক্ষণসুন্দর নমি তোমা লীলাময়।

আগেই আরম্ভে বলেছেন—

> সম্মুখে মম মহামেঘ-সম উদিত রূপেশ্বর,
> ব্রাহ্মী উষার জ্যোতিরুন্মেষে প্রণমিছে অন্তর।
> একি অনুভব, নব উৎসব, অদ্ভুত, অতুলন।
> মানব-ভাষার অভিধানে তার নাহি কোনো বিশ্লেষণ।

তাই শিল্পী সাধক সমালোচক ঠিকই বলেছেন যে কবিতা তৈয়ারী করবার জিনিস নয়, কবিতাকে করতে হয় সৃষ্টি, কবিতাকে গড়া যায় না, দিতে হয় জন্ম। সত্যিকার কবি unheard melodies শুনতে পান—সেই হচ্ছে তাঁর devotion to something afar, তাঁকে বলতেই হবে রবীন্দ্রনাথের মতো—

যত্তে বিশ্বমিদং জগাম দূরকর্ম। তত্ত আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥

তোমার যে মন এই সারা বিশ্বে সুদূরে চলে গিয়েছে তাকে আবার ফিরিয়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই স্ফূর্ত হবে রসের সিঞ্চন, কবিতার ধারা, কর্মের প্রবাহ, গানের সুর। এই তো সাহিত্যতীর্থের কাজ, এই তো তীর্থপতির অবদান। কবি করুণানিধানকে বলা যেতে পারে তিনি প্রেমের কবি—প্রকৃতি ও মানুষের—

'হেথায় তারা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যোস্না মাঝে
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-ঝালর
ধূসর পাষাণ-সীঁথির তটে—
অফুট ভাষে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।
তাদের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হারায় গোলাপ-বেলা।
কে অপ্সরী সারঙ বাজায়
কি অপরূপ সুরের খেলা।
নিদাঘ-রাতে রাখাল-ছেলে
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে।
তন্দ্রা ভেঙে দেখে তাদের—
দূর আকাশে মিলিয়ে যায়
পাখায় ঝরে সোনার রেণু
জ্যোস্নামাখা মেঘের গায়।'

[স্বপ্নলোকে। শতনরী

ভাষা ছন্দ প্রকৃতিপ্রেম করুণানিধানের কাব্যকে স্বপ্নালু মোহময় করে তুলেছে। এঁকে ঠিক রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের একজন বলে চিহ্নিত করব কি না জানি না তবে রবীন্দ্রপরবর্তী ও সমসাময়িক যুগের কবি তিনি এবং কল্লোল-

গোষ্ঠীর পূর্বসূরী! এক কথায় তিনি স্বপ্নরাজ্যের কবি, আধিজীবনের কবি তিনি নন, অধিজীবনের কবি তাই পরিণত বয়সে তিনি সেই অধিমানসেরই (overmind) বাসিন্দা, এক কথায় সাধক।

জীবলোকে তব অংশ প্রকাশ, তুমি আদি নারায়ণ,
দাও ছিঁড়ে দাও মায়া-মৃত্যুর মহাপাশ-বন্ধন।
সম্মুখে তুমি, পশ্চাতে তুমি, তুমি দক্ষিণে বামে,
তুমিই সৌম্য, তুমি ভৈরব, তুমি অঙ্কিত নামে নামে।
দিব্য অবাঙ-মানসগোচর ত্বং হি প্রাণের গতি;
নমো যুগধারী, বিশ্বম্ভর, ব্রহ্মাণ্ডের পতি।···
নূতন করিয়া গড়িতে নিয়তি, জ্বালিছ বিরজা হোম,
নমো গোবিন্দ, পূর্ণানন্দ ওঁম প্রশান্তি ওঁম।

ওঁম মানেই পূর্ণতা, ওঁম মানেই স্বীকৃতি, ওঁম মানেই শুধু পাওয়া নয় হওয়া। ওঁম মানেই পূর্ণাহুতি। কবি করুণানিধানের একটি কবিতার ভাবার্থ একদিন ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলাম হেলায় ফেলায়। সেইটির কিছুটা তুলে দিচ্ছি—

Births and deaths are but mystries
Can any one forecast, why we play this part with such eagerness
As if we are touching with a string a cup full of histories
But no one knows wherefrom comes this something more than keenness
Oh! thou Sky, O thou wishful winds that blow
Can't you make me wise about these flames that glow
Can one fight and struggle with one's own self
I feel defeated at every step
Before I accept it, and I surrender
All accounts, shall I have to render?

[পঞ্চাশ বছর পরে। শতনরী

কবিতার মধ্যে আছে একটি নিরাসক্ত অনীহা, এবং যাকে বলে ইংরাজিতে একটি Romantic fullness কিন্তু no morbidity. শ্রদ্ধেয় সুধীন দত্তের কুলায় ও কালপুরুষের 'স্রোতদার' তিনি নন। চণ্ডীদাস জয়দেব বাদশাহজাদী অর্কিউস ইউরিপিডিস্—সব মিশে গেছে। Walt Whitmanএর কথায় বলা যেতে পারে—Who touches this book touches a man.

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়েই করুণানিধানের স্মরণে যেন গাই—

জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।

ঋগ্বেদের ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্রে বলতে পারি 'অগ্নে জরস্ব' হে অগ্নি, তুমি প্রিয় হও, সমীপে এস—'চন্দ্রমগ্নিং চন্দ্ররথং, হরিব্রতম্'- তুমি আনন্দময়, আনন্দের রথ তোমার কর্মধারা তোমার জ্যোতির্ময়।

'একলা পথের যাত্রী'

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

এখনকার পাঠকের কাছে কবি করুণানিধানের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। পরমার্থের জন্য তাঁর যে আর্তি নানা কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে সেটা কি তাঁর রচনাকে সাম্প্রতিক কালের পক্ষে অনুপযোগী ক'রে তুলেছে? কিন্তু কবিতায় আধ্যাত্মিকতার রূপ কিংবা প্রকাশের ভঙ্গি নিয়ে আমাদের আপত্তি থাকলেও আধ্যাত্মিকতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অন্নময় প্রাণ থেকে চিন্ময় প্রাণে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর রয়েছে। শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি থেকে আমরা সব সময় মুক্তি পেতে চাইছি। 'চিরসুন্দর' কবিতায় করুণানিধান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত সুরে এই কথাই বলতে চেয়েছেন—

> বন-গিরিতে ঢের ঘুরেছি, মন ভরে নাই কিন্তু নাথ,
> ঊর্ধ্বে চেয়ে উদাস বুকে উধাও ছুটি দিবস-রাত—
> জ্যোৎস্না-মেঘে মগ্ন পাখায় লগ্ন ফেনমঞ্জরী—
> যাত্রী আমার পরাণ-পাখি নীল পারাবার সন্তরি।
>
> এই সুষমার সীমার শেষে ঘর বাঁধিতে উন্মনা—
> স্বর সহে না, —কোন্ ঠিকানা? ফুরিয়ে গেল দিন গোণা!
> সকল স্মৃতি দাও ঘুচায়ে, থাকুক শুধু এক স্মৃতি,
> জীবন থেকে দাও গো মুছে ভক্তিহীনের দুষ্কৃতি।

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ য়ুং বলেছেন—যৌবন কাটিয়ে মানুষ যখন মধ্য বয়সে পা দেয় তখন তার কাছে অধ্যাত্মজীবনের প্রশ্নটাই, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, যে মুহূর্তে মানুষ নিজের অধ্যাত্মজীবনের কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় সে মুহূর্তেই সে মানসিক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে। যৌবনে সে বহু বাসনায় বিড়ম্বিত, সংসারই তার সর্বস্ব, ওয়র্ডসোয়র্থ যেটাকে 'the world is too much with us' বলেছেন। যৌবনোর্ধ্বে তার ক্রমশ উপলব্ধি হয়, শ্রেয়কে ছেড়ে সে প্রেয়ের দিকে ঝুঁকেছিল; অল্পের জন্য বহু হারাতে বসেছিল। তখন তার লক্ষ্য বদলায়। প্রাতিভাসিকের আপাত-রমণীয় পথ ছেড়ে সে তখন পারমার্থিকের ক্ষুরধার-দুর্গম পথে পদক্ষেপ করে। নূতন লক্ষ্যবস্তুর নামকরণ কি হবে সেটা বড় কথা নয়। যদি বলি 'ঈশ্বর', তাতেই বা দোষ কি? ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা নিজের নিরাপত্তার জন্য নয়; সেটা ঝড়ের রাতে আত্মার অভিসার, সেটা অপ্রাপনীয়কে পাওয়ার বাসনায় অকারণ, অবারণ চলা। দার্শনিক অ্যাল্‌ফ্রেড্ নর্থ হোয়াইট্‌হেডের ভাষায়—

The worship of God is not a rule of safety—it is an adventure of the spirit, a flight after the unattainable.

(*Science and the Modern World*)

আঁদ্রে জীদ্ একবার লিখেছিলেন, মরমী না হলে মানুষ কোনো বড় কাজ করতে পারে না। এই কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, মরমী না হলে বড় কবি হওয়া যায় না। মহান্ কবির এই একটা অন্তত বড় গুণ করুণানিধানের রয়েছে। তাঁর 'প্রাণের ভাষা'তে ঈশ্বর-সান্নিধ্যের জন্য আকুলতা অন্তর থেকে উৎসারিত—

দেখতে তোমায় পাইনে ব'লে সুখ তো নাহি নাথ,
কখন তব নাগাল পাব, বাড়িয়ে আছি হাত,—
ডাকছি তোমায় শূন্য জুড়ে আকাশ-ধ্বনি আসছে ঘুরে
তারার সাথে জাগছি একা প্রভাত-হারা রাত!
অশ্রু আমার অশ্রু নহে—নয়ন-পাতা-ভরা,
বিরহেরি শরৎ রাতের শিশির-কণা ঝরা;
হৃৎ-সাগরের বেলার 'পরে, তুষার-শাদা ফেনার থরে
ফুটবে না কি আলোর লীলা ভুবন-মনোহরা!

রবীন্দ্রনাথের রাগিনীর আভাস শোনা যাবে, কিন্তু সেটা করুণানিধানের কবিতায় কোনো ছন্দপতন ঘটায় নি। রবীন্দ্রানুসারী হয়েও তিনি তাঁর স্বকীয় দ্যুতিতে দীপ্যমান। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ-রজনীকান্ত সেনের মিলিত প্রতিধ্বনিও আমাদের কানে আসে, যেমন ওই কবিতারই প্রথম অংশে—

অপমানে চূর্ণ করো আমার অহঙ্কার
দীর্ণ করো অবিশ্বাসের পাষাণ গুরুভার—
সন্তানেরে শাস্তি দিতে বাজবে ব্যথা দয়াল চিতে,
তুমিই আছ বিপথ হতে আমায় ফেরাবার।

এই প্রতিধ্বনি ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করে না, ধ্বনিকে নূতন বাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। মরমী কবি রূপে রবীন্দ্রনাথ অতলস্পর্শী গভীরতায় অবগাহন করেছেন। হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে রজনীকান্ত অসাধারণ মর্মস্পর্শী ক'রে তুলেছেন। করুণানিধানের বৈশিষ্ট্য অন্য দিকে। তাঁর কবিতায় আমরা অনেক সময় ভাবাবেগ ও শমতার একটা দুর্লভ ভারসাম্যের পরিচয় পাই যেটার ফলে তাঁর কবিতার প্রভাব পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী। অন্তরের হাহাকার যে রচনার প্রথমাংশে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে—

মোর এ শুষ্ক পাণ্ডু অধরে চুম্বন করো দান,
স্নায়ুতে শোণিতে আসুক বন্যা ভাসিয়া সর্ব প্রাণ।

মন্থন করি অন্তর মোর হে অনুত্তম নাথ,
অর্পিয়ো তৃষা ওগো প্রাণাধিক দাও প্রসারিয়া হাত।

সেই লেখাই ('যাচনা') শেষ হচ্ছে শান্ত-প্রার্থনার শান্তি-শ্রাবণ ধারায়—

লও প্রভু লও করুণা করিয়া উদ্দেশে সঁপিলাম
মোর জগতের মলিন মাধুরী মরমের অভিরাম;
দাও দাও তব মনের মহিমা রেণু-কণা-পরিমাণ
কান্ত-আঁখির অমৃতধারায় শান্ত হউক প্রাণ।

আবেগ ও স্থিরতার এই সমন্বয় করুণানিধানের কবিতাকে শুধু স্বতন্ত্রই করে নি, আকর্ষকও করেছে।

দুই

অনন্তের সন্ধানে মানবের যে যাত্রা সেখানে সে একা, নিঃসঙ্গ। আমাদের অনেকের মতো কবি করুণানিধানকেও একলা চলতে হয়েছে। পথের কাঁটাতে তাঁর চরণতল ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তবু তিনি নিরস্ত হন নি। কামনা যেখানে প্রবল, প্রার্থনা ঐকান্তিক, সেখানে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে তো চলবে না। তাই নিজেকে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন তারই মধ্যে উত্তর নিহিত রয়েছে—

প্রহেলিকার গোলক ধাঁধায় ক্রোশের পরে ক্রোশ চলি,
রহস্যময় পরশমণি ভরবে কখন অঞ্জলি!
ঘোর বিপদের ছদ্মবেশে মঙ্গল আসে, ভয় কি তোর?
সাধন পথের বিভীষিকায় শঙ্কা কিসের, আত্মা মোর? [চিরসুন্দর

তিনি 'পণ' করেছেন, আমাদের বরেণ্য পূর্বপুরুষদের অনুসৃত পথই তাঁর পথ। চিত্ত তাঁর ভয়শূন্য, উচ্চ তাঁর শির—

আমরা ভাগ্যবান্, দিক-অতীতের ওপারে ধ্বনিত অপৌরুষের গান।
দাঁড়ায়েছি গরীয়ান্, অন্ধকারের নিগূঢ় রন্ধ্রে বিদ্ধ জ্যোতির বাণ।
ধাই দিবা-শর্বরী, জনম হইতে জনমান্তরে অজেয় শকতি ধরি।

ভারত-সন্তান রূপে, অর্থ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রূপে করুণানিধান অজেয় শক্তি ধারণ করেছেন এবং এই শক্তি তাঁর চলার পথের পাথেয়। 'মঙ্গল-গীতি' কবিতায় তিনি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক মহিমা কীর্তিত করেছেন। তাঁর সমানধর্মা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই অতীত ঐতিহ্যের গৌরবময়ী বাণী বারংবার স্মরণ ক'রে প্রেরণা পেয়েছেন; 'সোমনাথ'-মন্দিরের নব নব নির্মাণের মধ্যে ভারত-আত্মার চিরন্তনী সাধনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভারতের ধর্ম, ভারতের সংস্কৃতি থেকে করুণানিধান অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, পেয়েছেন এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ। চরৈবেতি। পথ থেকে পথে,

তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে তাঁর পরিক্রমা চলেছে। 'কুরুক্ষেত্রে, গয়া, গঙ্গায়, বারাণসী, পুষ্করে।' চলেছেন 'সেই পথে, যার 'পরে আলো না ফুরায়'। 'পদ্মা-তটে'—

জানি নে যাত্রা কোন্‌খানে শেষ কবে উতরিব সন্ধ্যার দেশ,

পূর্ণ পক্ক ফলের মতন বৃন্তভ্রষ্ট টুটিবে জীবন সকল বেদনা এড়ায়ে।'

যখন যেখানে যাচ্ছেন, একই লক্ষ্যে কবি রয়েছেন স্থির, অচঞ্চল। একই অন্বেষণ নিয়ে দেশে-বিদেশে, সমুদ্র-পাহাড়ে ঘুরেছেন, প্রবেশ করেছেন অরণ্য-গহনে। রূপতীর্থে তিনি অরূপকে খুঁজে ফিরেছেন। যে পাওয়ার পরে আর কোনো পাওয়াকেই বড় মনে হয় না সেই পরম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর বুকে। পদ্মার তটে তাঁর নূতন অভিজ্ঞতার জন্ম হচ্ছে। রুদ্রের দারুণ দীপ্তিতে জীবনের নূতন রূপ উদ্ভাসিত হ'ল। আগের স্বপ্নঘোর, তন্দ্রাজড়িমা এখন ছুটে গেছে—

সোনালী-সবুজ গাঙ্‌ভরা জল একূল-ওকূল করে টল্‌মল্—

মেঘ-রথে কারা করে আনাগোনা দুলায়ে উড়ায়ে তসর ওড়না

ভাঁজে ভাঁজে ছায়া জড়ায়ে।

ভাঙিল নিমেষে সে রঙ্‌মহল, নিবিল গোধূলি গোলাপ-পাটল;

লুকোচুরি শেষ কিরণ হুরীর, মণির মিনার মেঘের পুরীর

কোথায় গেল রে মিলায়ে?

করুণানিধান যেন কীটসের 'Sleep and Poetry' কবিতার অবিস্মরণীয় ছবিকেই অভিনব সজ্জায় সাজিয়েছেন—

Yes, thousands in a thousand different ways
Flit onward—now a lovely wreath of girls
Dancing their sleek hair into tangled curls...
The visions all are fled—the car is fled
Into the light of heaven, and in their stead
A sense of real things comes doubly strong.

বাঙালী কবির 'sense of real things' অবশ্য অন্য সুরে ঝংকৃত। একটি ক্ষণ-মুহূর্তের জন্য দিব্য-অনুভূতি তাঁকে চেতনার নূতন স্তরে উন্নীত করে দিয়েছে—

ঢাকিল মসীতে মানস-কানন, যা-কিছু আছিল আঁখি-রঞ্জন—

আঁধারে বিধুর ধূ ধূ করে মাঠ, কপিশ আকাশে উদাসীন ঠাট

কে আছে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে!

ঘর্ঘর-ঘোষ বজ্রস্বনিতে লহর তুলিল সকল শোণিতে—

হেরিনু মূরতি ভীতি-ভঞ্জন, কণ্ঠে দোদুল হরিচন্দন

পরাগের ধূম উড়ায়ে।

এই 'পরম-ক্ষণ'টিতেই সারা জীবনের নিঃসঙ্গতার বেদনা এক নিমেষে ধুয়ে মুছে যায়। তখন মনে হয়—'একলা পথের যাত্রী তবু, আজ তো আমি নই একা!'

শতনরীর কবির শততম জন্মদিনে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন অনুজ কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। রবীন্দ্র-ভাবধারায় অনেকটা আশ্রিত হলেও তাঁর স্বকীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

করুণানিধানের প্রকৃতিপ্রেমে গভীর আস্তিক্যবোধ ও সুগভীর মমতার ব্যঞ্জনা।

শেষ মিনতি শেষ-তৃষাতে পাই নি নাগাল আকুল হাতে—
রূপ হারালো রূপের লীলা বনপলাশে আলোক ঢেলে।

সৌন্দর্যচেতনায় কবি করুণানিধানের কবিতা জাগ্রত, ছন্দমধুর কিন্তু সৌন্দর্যের দীপ্তিতে তাঁর কবিতা ঝলমলে নয়—সেখানে একটা সূক্ষ্মবেদনার অনুভূতি জাগে। সে বেদনা যেন সৌন্দর্য ঘনীভূত নানাবিধ রত্নালঙ্কারের মধ্যে একটি সরু হারের চিকচিকানি—

হের সখি সেই দিনান্তের তারা তেমনি জ্বলে—
ডালিম-ফুলের রঙটি ফুলানো মেঘের কোলে!

কবি করুণানিধানের এই প্রকৃতি-সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রানুসারী আর এক কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-প্রাণতার আশ্চর্য মিল খুঁজলেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যদিও বহিরঙ্গতায় আর ছন্দনিপুণতায় কাব্যের বাক্যচ্ছটায় এবং ধ্বনি তরঙ্গতায় সে কবির সঙ্গে সৌন্দর্য বিধুর প্রাণতার বিস্তর ফারাক দেখা যায়।

আমার রচনার এইটুকু অংশ পর্যন্ত যখন পাঠ করেছি, সেই সময় কবি করুণানিধান যিনি ততক্ষণ আমার ভাসা-ভাসা তরল রচনাটি একাগ্রচিত্তে শুনছিলেন, হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন—'আবার কাকে টানলে হে, আমার পাশে।' আমি বললাম—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা বলছি। আমি কিন্তু সুন্দর মিল পেয়েছি আপনার কবিতার সঙ্গে সত্যেন দত্তের কবিতায়। যেমন আপনার কবিতার পাশে আমি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি—

আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে;
বিষন্ন যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে অট্ট-হাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হল—সাহসিকা অপ্সরার মতো।

করুণানিধান বললেন—'তা বেশ করেছ।'

আমরা কয়েকজন কিশোর-সাহিত্যিক মিলে একখানি হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক

পত্রিকা প্রকাশ করতাম 'খেয়ালিয়া'. নামে। 'খেয়ালিয়া'র সম্পাদক ছিলাম আমি। শারদীয় সংখ্যায় 'রবীন্দ্রমণ্ডলের কবি' বলে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সে প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলাম আমি।

একদিন উপস্থিত হলাম কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি তখন শ্যামপুকুর অঞ্চলের রামধন মিত্র লেনের একটি বাড়িতে থাকতেন। বিলুপ্ত 'খেয়ালিয়া'কে ছাপা কাগজে পরিণত করতে তখন আমাদের মনের প্রবল বাসনা। ছাপা কাগজ বের করা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তো কিছু নেইই, তবু বাসনা প্রবল। ঘড়ি-আংটি বেচেও যদি দু'চার সংখ্যা বের করা যায় —এই মনোভাব আর কি। মনের একান্ত বাসনা আসন্ন মুদ্রিত 'খেয়ালিয়া'র জন্যে কবি করুণানিধানের একটি কবিতা হস্তগত করা। আর সেই জন্যেই সেই বালখিল্য প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রমণ্ডলের কবি'কে আধুনিক কায়দায় বেশ কিছু মাত্রায় পরিমার্জনা করে আমরা গিয়ে একদা এক সন্ধ্যায় সমুপস্থিত হলাম কবি সদনে।

ওপরের একখানি স্বল্পালোকিত ঘরে কবি তখন বসে আছেন গায়ে গলাবন্ধ টুইলের সার্ট। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মশায়ের পুত্র দেবরঞ্জন এবং তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুকে কবি সস্নেহে আহ্বান জানালেন।

আমার লেখা প্রবন্ধ সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আসার পরই থেমে গিয়েছিল। করুণানিধান বাবু বললেন—'তা ভালোই তো! ভালোই লিখেছ।'

উৎসাহ পেয়ে বললাম—আমাদের 'খেয়ালিয়া'র প্রথম সংখ্যায় আপনার একটি কবিতা চাই-ই কিন্তু।

কবি উত্তরে বললেন—'তোমাদের কাগজ, তোমরাই লিখবে। আমাদের লেখা তো শেষ হয়ে গেছে।'

তবু নিরুৎসাহিত হলাম না। বললাম—'উত্তরণে'র কবি তো শেষ হতে চান নি।

> ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা, প্রণমে মন
> পেয়েছি তোমার বিল্যতে মধু নির্ঝরণ।
> মৃত্যু হাসিয়া প্রসাদ বিতরে
> কাঁপে থর থর বুকের ভিতরে
> বাই গো তরণী কোন কূলে শেষ উত্তরণ?

কবি মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন—'তোমার স্মরণশক্তির তারিফ করি। লেখক হতে গেলে ভালো পাঠক হওয়া দরকার। আজকাল এটা দেখছি কমে আসছে—যাঁরা লেখেন অপরের লেখার তাঁরা বড় একটা ধার ধারেন না। একটা গল্প বলি শোনো।'

কবির কথায় ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বললাম—বলুন, আপনাদের কালের

কথা। কবি বলতে লাগলেন—'তুমি যে সত্যেন দত্তকে আমার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছ সেই সম্পর্ক ধরে বলি।'

গল্প শোনবার জন্যে আমরা তাঁর আরো কাছাকাছি এসে বসলাম। কবি করুণানিধান শুরু করলেন—'আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম 'দ্বিপ্রহরে'। পড়েছো কিনা জানিনে।'

বললাম—ঠিক মনে পড়ছে না। কবিতাটি বলুন না, শুনি।

করুণানিধান আবৃত্তি করলেন—

স্বপ্নময় তার কাহিনী—আজকে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে—
নোনা-আতার সোনার গায়ে রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে।

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—কী অপূর্ব চিত্রকল্প। নোনা-আতার গায়ে সূর্যের আলো পিছ্‌লে পিছ্‌লে পড়ছে। আহা।

কবি করুণানিধান বললেন—'সত্যেন দত্ত এই কবিতা পড়ে ছুটে এসে আমাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে গেলেন। সে কী আনন্দ-অভিবাদন, মনে হল আমার লেখা সার্থক! প্রকৃত সমজদার পাঠকের মনে তার রূপরঙ প্রতিফলিত হয়েছে।'

—তার পর? আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করলাম।

কবি উত্তর দিলেন—'তার পর আমার পালা। Rare word jewels নির্বাচন, সৃষ্টি ও প্রয়োগে সত্যেন দত্ত বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় কবি। তাঁর কবিতা 'নীল পরী' প্রকাশিত হয়েছে, রাতে বিছানায় শুয়ে সেই কবিতা পাঠ করছিলাম—

ঢুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় ফুলের তুমি চল কিয়ার,
তন্দ্রা তোমার সুর্মা-চোখের তন্দ্রা তোমার আলতা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ দুহে নাও তার বিজুলী শিং ধরি,
নীল পরী গো নীল পরী।

সারা রাত সুখের আচ্ছন্নতায় বিজুলী শিং বারবার চমক দিয়ে যায়; আহা কী বর্ণনা!

পরের দিন সকালেও তন্দ্রার ঘোর কাটে না—'তন্দ্রা তোমার সুর্মা-চোখের তন্দ্রা তোমার আলতা পায়'। এ-লাইন কি ভোলা যায়?

সংসারের দাবি—বাজার যেতে হবে না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যেতে হবে।

বাজারের থলিটি হাতে নিয়ে বের হলাম। কিন্তু বাজারের পথ কোথায়। সারা রাস্তা ধরে মনের মধ্যে ছন্দের গুঞ্জন আর নীল পরীর ঢুল লাগা রূপের বাগার আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ কি, কোথায় এসে পৌঁছালাম! বিডন স্ট্রিটের কাছে মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। সত্যেন্দ্র-আবাস। কবি বাড়িতেই ছিলেন। আবেগে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে।

তার পর সকালের জলযোগ, চা পান আর আড্ডা। আড্ডা আর আড্ডা, দুজনে দুজনের কবিতা পাঠই শুধু নয়, পাঠের আসরে এলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, যতীন বাগচি, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস আরো - হ্যাঁ, আরো একজন, যতীন সেনগুপ্ত।

বেলা বাড়ে—আড্ডা আর থামে না।

অবশেষে ঘরের দরজার কাছে উসখুসুনি। সত্যেন্দ্রনাথ সেদিকে তাকালেন —এই যে উঠি এবার।

তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- বেলা অনেক হল। গিন্নীর অনুরোধ এত বেলায় আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই-- এইখানেই যা হোক দুটি ডাল ভাত।

সে কি ? চমকে উঠলাম। ঘড়িতে বেলা বারোটা, বড় আর ছোট কাঁটা দুটি একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আমাকে ভাই বাজার করতে হবে। বাড়ি শুদ্ধ এখনো অভুক্ত। তাড়াতাড়ি যা হোক কিছু বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়ি শুদ্ধ শুধু অভুক্তই নয়—চারদিকে ছুটো ছুটি খোঁজ-খবর শুরু হয়েছে— 'কলকাতায় কোন সে বাজার বসেছে যেখানে সকালে বেড়িয়ে বেলা বারোটায়ও বাজার শেষ করে ফেরা যায় না।'

কবি করুণানিধান থামলেন। আমরা উঠলাম। কিন্তু উঠতে কই পারলাম--কবি সহাস্যে মন্তব্য করলেন—'তোমরা তো হে বাজার করতে বেরোও নি। এত তাড়া কিসের ? চা জলযোগ করো। এসে পর্যন্ত তো শুধুই কথা আর কথা !'

আমরা বললাম—এ কথায় যে দাম কত অপরিসীম !

'তা যদি বলো তা হলে আমার কবিতার বদলে আমার এ কথাই কেন তোমাদের 'খেয়ালিয়া'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করো না।'

কবির প্রস্তাবে মহা-আনন্দে সম্মত হলাম—ঠিক বলেছেন, অপূর্ব এ-কাহিনী আজকের পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা উচিত।

কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় কবি করুণানিধানের জীবিতকালে এ-কাহিনী প্রকাশ করতে পারি নি। কেন না, ঘড়ি-আংটির বিনিময়েও মুদ্রিত 'খেয়ালিয়া' প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নি।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্ণিক রায়

রবীন্দ্র-প্রভাবিত পঞ্চকবি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা জানি না, আমার নিজের বিশ্বাস হয় নি, কিন্তু সকলেই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার গোপন মধুর অদৃশ্য গন্ধে বিমোহিত, করুণানিধান ছাড়া আর সকলেই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলতে পারেন—'আমি প্রকাশিতে পারিনে, শুধু চাহি কাতর নয়নে।' করুণানিধানই নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন নিজের ভাষায়। বস্তুটা রবীন্দ্রনাথেরই, সেই গন্ধে তিনি বিমোহিত, কিন্তু তাকে আপন করে নিয়েছেন, এবং ভাষায় প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেখানে নিত্যই নতুন হয়ে ওঠেন, সব বুঝতে পেরেও একটা অবোঝা বেদনার নিগূঢ় রহস্য আমাদের পাগল করে, যে-রহস্য থেকে কখনোই আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না, এমনি রহস্যময় গন্ধের গাঢ়তা করুণানিধানে পাবো না, কেন-না নতুনের বিস্ময় তাঁর মধ্যে নেই, কিন্তু যা আছে, তা হলো মুগ্ধচৈতন্যের বিস্ময়ের আনন্দ। তিনি আমাদের নিটোলতায়, সুষমতায়, সুস্পষ্টতায়, বেদনার সামগ্রিকতায় একটা পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে যান।

পঞ্চকবিকে আর একটা দোষে মেরেছে, অথচ এই দোষটাই তাঁদের কালে খ্যাতি দিয়েছে প্রচুর, সেটি হলো সত্যেন্দ্রনাথের ভ্রষ্ট ছন্দ এবং অপরিচিত ও অদ্ভুত শব্দ। অপরিচিত শব্দ বিস্ময় আনে যখন যথাযথ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আঘাত দেয় যখন কবিতার মধ্যে বেমানানভাবে বসে। এমনিভাবে ইনভার্টেড কমা দিয়ে শব্দ ব্যবহার কবিতায় অশোভন, অথচ এই অশোভন ব্যবহারই ঘটেছে এঁদের কবিতায়, যেমন করুণানিধানও ব্যবহার করেছেন—'বাজে জংলি 'পিলু' যৌবনেরই নন্দনে'। পিলু রাগিনী শব্দটা ব্যবহার করতে হবে, তাই 'পিলু'কে এনেছেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতে স্বরবৃত্ত ছন্দ কোমল বেদনায় পরিণতি লাভ করেছে, কিন্তু এঁদের হাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের পদশত দৃঢ় শব্দে উচ্চকিত কানে শোনা যায়।

'পালিয়ে এলাম শিকল ছিঁড়ে বনের কোণে নিরালাতে।'

একটি ব্যাপারে পঞ্চকবিদের গোষ্ঠীবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়, এঁরা মাটির দিকে তাকিয়েছেন, মাটির মানুষের কথা বলেছেন, যেখানে বাস করেছেন সেখানকার গৌরব প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বে তাকাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ মাটির কথা বলতে বলতে কখন ঊর্ধ্বালোকে অজানা জগতে উধাও হয়ে যান। 'পূব হাওয়াতে দেয় দোলা' এটা—বাইরের, পৃথিবীর, বস্তুর দোলা, তার পরই রবীন্দ্রনাথ বলেন—'হৃদয় নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।' যখন এই লহরী জাগে তখন তো ব্যথা কূল মানে না, বাধা মানে না, পরানও

ঘুম জানে না, জাগা জানে না, তখন রসের বানে বিভাবরী ভেসে যায়। পুব হাওয়া বন্যার প্লাবনে আমাদের দিগন্ত সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এঁদের কবিতা পড়ে আমরা এই ভেসে যাবার আনন্দ পাই না।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণে ও নকলে এঁরা সাময়িক বিষয়ের ওপর কবিতা রচনা করেছেন, স্থান মাহাত্ম্য রচনা করতে গিয়ে ইতিহাস এনেছেন, ভৌগোলিক সীমার কথা বলেছেন এঁরা, কিন্তু কবিতা হয় নি। অনেক তথ্য জানি, কিন্তু হৃদয়ের আলোড়ন ঘটে না জলের ঢেউএ। কিন্তু করুণানিধান এর মধ্যেও মাঝে মাঝে অপূর্ব বেদনার ঢেউ জাগাতে পারেন—

নীল গাঙে তোর আলোর খেয়া ডাক দিয়েছে আজ মোরে,—
জল ভরে মা, মনের চোখের কূলে।
লুটিয়েছি মা তোর মাটিতে. কাঁচা সোনার কৈশোরে,
ফলত ফসল কান্না-হাসির স্কুলে। (শান্তিপুর

'নীল গাঙ 'আলোর খেয়া' রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়িয়ে দিলেও বেদনা এখানে সঞ্চারিত হয়েছে, কিন্তু এর পরেই তিনি ইতিহাস পুরাণের তালিকা দিয়েছেন এতে আর উৎকট হৃদয়ের নির্যাস ফুটে ওঠে না। তবে এ কথাও ঠিক যে-কোনো প্রকারেই হোক, বাংলার ঐতিহ্যকে এঁরা টেনে এনেছেন কবিতার মধ্য দিয়ে। সাধারণ পাঠক কাব্যে হয়তো এটাই চায় এবং সাধারণ পাঠককে এদিক থেকে এঁরা তৃপ্তি দিয়েছেন। করুণানিধানের 'সে' কবিতার মধ্যে রোমান্টিক সৌন্দর্য ব্যক্ত হয়েছে—মনের চোখে মেঘময় দিনের কাজলের রহস্য, এই রহস্য হৃদয়ের পাগল অর্থাৎ কবিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এই পাগল মনের চোখে চোখে রহস্যময় আলোয় তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপ দেখেছেন; সন্ধ্যা তারায় সন্ধ্যামণির দল গঠিত, বাতাস তার কালো চুলের ফুল লুটিয়ে দেয়। প্রকৃতি দিয়ে গড়া এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বিরহে কবির, হৃদয়ে বেদনা বাজছে, কেন না তার অধরসুরার সুবাস এখনো কবির মুখে লেগে আছে।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যলক্ষ্মীর থেকে করুণানিধানের কবিতার পার্থক্য। অধরসুরার সুবাসের মধ্যে একটা ভিক্টোরীয় ফ্যাসন আছে, যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নেই।

কিন্তু এই ফ্যাসন ডুবে যায় যখন কালো আঁখির আলোয় পূর্ণিমা পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায়, মধু যমুনা পর্যন্ত তার স্পর্শে গুলিয়ে যায়।

এই সৌন্দর্যরাণী চন্দ্রালোকিত গঙ্গায় খেয়া পারাপার করে, এবং সমুদ্রের দিকে উধাও হয়ে যায়। সমস্ত সুর ও সংগীত তার মধ্যে মূর্ত। বসন্তের ফুলের সঙ্গে তার যোগ, পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, সকলের সঙ্গেই তার মিলন। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রসাদেই পৃথিবীর আদিকাব্য কবি পড়তে পারেন। তাই তাকে তিনি আহ্বান জানান এই দুঃখময় জীবনে দুঃখহরণ করবার জন্যে। কেন না

এই জগৎটা সাপের মতো বিষ ঢেলে দিচ্ছে বুকে, ঝড়ের হাওয়ায় অস্ফুট ফুল ঝরে পড়ে—

ফিরে এস গো মোর সাগর সখা ফুলরা
সখি জাগো বারেক জীবন পথের দুখহরা
এই জগৎ নাগের বিষের জ্বালা বুকের মাঝে জড়িয়েছে—
ঝড়ের হাওয়া বেল কুড়িদের ঝরিয়েছে।

শেষ দুটি পঙক্তি কীটসের কবিতার মতো। এই বিষের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আহ্বান কবির হৃদয়ে জাগছে। মনের মধ্যে মেঘময় রহস্য জাগিয়ে চিত্তকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছেন। কিন্তু চিত্তকে ভুলিয়ে আমরা কতক্ষণ থাকতে পারি।

দুয়ের বিরোধ আছে, কিন্তু এই বিরোধের স্বরূপ কি? জগৎ যে নাগের বিষ, তার পরিচয় কোথায়? আমাদের হৃদয়ে কোন ছাঁচে এই বিষ অন্ধকবি তৈরি করছে কবি দেখাতে চান নি, এড়িয়ে গেছেন। এই যুগের এই চেতনা কবিতার ক্ষেত্রে থাকলে কবিতার শরীর আরো পূর্ণ হয়ে উঠতো। যে-কল্পনা যুগের ও সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তা কখনো সত্য হয়ে উঠতে পারে না।

আর এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী-তো শুধু কবিকে রূপে ভুলিয়েছে, কিন্তু এই রূপোন্মাদনা তাঁকে কেমনভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার কথা পাই না। রবীন্দ্রনাথ বলেন —

মিশবে যে আজ অকূল পানে তোমার গানে আমার গানে
ভেসে যাবে রসের বাণে আজ বিভাবরী।

এই রসের বাণের আনন্দ গান আমরা পাই না বলে শুধু রূপ দেখে ভুলে যাই। আমরা দিবাস্বপ্ন দেখি। কিন্তু দিবাস্বপ্ন তো ভেঙে যায়, ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের ব্যথা এঁদের কবিতায় পাই না। স্বপ্ন এবং স্বপ্ন-ভেঙে যাওয়া ব্যথা—এই দুয়ে মিলে জগৎ, এই জগতের পরিপূর্ণ রূপই কবিতা। করুণানিধানে তাঁর একটি রূপ দেখি, সেটি সৌন্দর্যমুগ্ধ রূপবিহ্বল স্বপ্ন, এবং এই স্বপ্ন তিনি নিজেই দেখেছেন, এই স্বপ্নজগতের কথা শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। কিন্তু তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে আনন্দের সুখে রাত কাটিয়েছেন করুণানিধান, অন্য সাথি কবিরা তা পারেন নি, শুধু স্বপ্নের কথা শুনেছেন, এখানেই করুণানিধানের সঙ্গে অন্য কবিদের প্রভেদ। এবং এই কারণেই তিনি স্মরণীয়।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে

ভূনাথ মুখোপাধ্যায়

এই শুভক্ষণে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর আত্মার উদ্দেশে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমি চিত্রকলা ভাস্কর্যের আজীবন ছাত্র, তবে আশৈশব কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীতের অনুরাগী। তাই কবি-সাহিত্যিক-সঙ্গীতশিল্পীগণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজীবন। সেই সূত্রেই আমি লিখবো শুধু কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আমার স্মৃতিকথাটুকু।

কবি করুণানিধান যখন শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের ছাত্র, তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়। পরে, কবি যখন অখণ্ড বাংলায় কীর্তিমান, তখন ঐ দাশ মহাশয় শান্তিপুরস্থ গড় অঞ্চলে সুত্রাগড়-নদীয়া-মহারাজা-হাই-ইংলিশ স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে আসেন। একদিন বাংলা রচনার ক্লাশে, আমার তখনই লেখা একটি কবিতা শুনে তিনি আনন্দে বলেন—'তুমি Improvisator বা প্রত্যুৎপন্নমতি কবি। আমার প্রথম জীবনের কবি-ছাত্র করুণানিধান, শেষ জীবনের তুমি। আশীর্বাদ করি করুণার মতো কীর্তিমান হও।' এতে কাব্যসাহিত্য-সাধনায় জীবনের প্রথমেই উৎসাহিত হই এবং কবি করুণানিধানকে একান্ত আপন ক'রে পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ। কবির কাছে যাওয়া আসা ঘন ঘন। অনেক সময় অসুস্থতা বশতঃ কবি নিজ হাতে না লিখে, মুখে ব'লে যেতেন আমি লিখে দিতাম। সে সময় সযত্নে আমাকে কত খাইয়েছেন। কবিতা প্রসঙ্গ বা আলোচনা ছেড়ে, তাঁর কাছ থেকে উঠে আসতে মন চাইত না। কখনও বা শান্তিপুর জনপদের হৃদপদ্মে অবস্থিত তাঁর পথিপার্শ্বের ধর্মশালা আবাসে, দেখতাম দিগদিগন্তের জনসমাগম। সেই সমাবেশ মুখর হত কবি সাহিত্যিক এবং কবির গুণমুগ্ধগণের সমাগমে, কাব্যসাহিত্য-সংস্কৃতির সেই আলো শান্তিপুরকে বহুদিন আলোকিত ক'রে রেখেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় যখন বোমাবর্ষণ হয়, তখন শান্তিপুর হয় বহু দিশাহারা শরণার্থীর আশ্রয়। এ সময় শান্তিপুরে কবির উপস্থিতি ও সান্নিধ্য অনেককেই সুস্থ পরিবেশে থাকতে সাহায্য করে। তখন শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ, বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদ, অদ্বৈতপাট ও কাব্যতীর্থ কৃত্তিবাসের ভিটা প্রভৃতি স্থানে আয়োজিত কাব্যসাহিত্য-সংস্কৃতির আলো অনির্বাণ শিখায় জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তো কবি করুণানিধান। নিষ্প্রদীপের মহড়ায় জনপদের আলো নিভে গেলেও কবি তাঁর প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে বসেছিলেন।

কবির শান্তিপুরে অবস্থান কালে, শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ প্রাণ-চঞ্চল মূর্তি ধারণ করে। বহু সভায়, পূর্ণিমা সম্মিলনীতে অনেক সময় চার-পাঁচশ

লোকের সমাবেশ হয়েছে। অনেক সময় কলকাতা, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু কবিসাহিত্যিক বহুবার সেখানে সমবেত হয়েছেন। তা ছাড়া পুরাণ পরিষদে, বাবলার অদ্বৈতপাটের উৎসবে, কৃত্তিবাস জন্মোৎসব সভায় এবং শান্তিপুর অঞ্চলের নানা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি, সভাপতিত্ব এবং নানাভাবে সহযোগিতা নদীয়া শান্তিপুরের সাংস্কৃতিক জীবনে উৎসাহের প্লাবন এনে দেয়। সেই পরিবেশে ঐ অঞ্চলের বহু তরুণ যারা কবির কাছে কাব্যসাহিত্য-সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করে ; তারা এখনকার বঙ্গকাব্যসাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকা।

কবির শান্তিপুর অবস্থান কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাজাগোপাল আচারিয়ার কৃষ্ণনগরে উপস্থিতি সভায় যে চারজন ব্যক্তি যোগদান করেন, তার মধ্যে কবি করুণানিধান অন্যতম। শিল্পী হিসাবে আমিও আমন্ত্রিত হই সেই সঙ্গে। কবি ছিলেন প্রচার বিমুখ। যাঁরাই তাঁকে জেনেছেন ও দেখেছেন, তাঁর কবিতা পড়েছেন, তাঁরাই শ্রদ্ধার আসনে তাঁকে বরণ করেছেন।

কবির জীবিতকালে, অখণ্ড বাংলায় ছিল একটি কবি পরিবার। করুণানিধান ছিলেন ঐ পরিবারে রবীন্দ্রনাথের নিকটতম। তাঁর জীবনকাহিনী আছে নানা জনের স্মৃতিতে।

কবি ও আমার জন্মস্থানের দূরত্ব খুব বেশি নয়। আমি তাঁর বত্রিশ বছর পরে এসেছি পৃথিবীতে। তাঁর স্নিগ্ধ স্নেহধারায় অবগাহন ক'রে ধন্য হয়েছি। শিল্পকলার শিক্ষা শেষে কবির কাছে আমার যাওয়া আসা বৃদ্ধি পায়।

১৩৪৩ সাল। তিনি সাহিবগঞ্জে আমি কলকাতায়। পত্রযোগে ঠিক হয় ১৩৬৪ সালের পঁচিশে বৈশাখ তাঁর 'রবীন্দ্র-আরতি' কবিতার বইখানি প্রকাশিত হবে। ঐ কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপটের জন্যে আঁকলাম একখানি চিত্র। পাঁচটি ধূপ আরতির সমাবেশে আর তার লীলায়িত শিখায় রূপায়িত অক্ষর কয়টি—'রবীন্দ্র আরতি'। অক্ষয় জীবনের বর্ণ গাঢ় সবুজের জমিতে, অসীম-জ্ঞানরূপ স্বর্ণ রঙে রঞ্জিত হ'ল চিত্রটি। কবি বড় সুখী হলেন। ঐ প্রচ্ছদ পরিকল্পনাই তিনি অনুমোদন করলেন।

রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে ১১-১০-১৯৩৬ তারিখে আঁকা আমার একটি পেন্সিল স্কেচ আছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরও আছে। পরে একসময় ঐ রেখাচিত্রের নীচেয় আমি বিশ্বকবির উদ্দেশে একটি ছোট কবিতা লিখে পাঠ ক'রে বিশ্বকবির হাতে দিই শান্তিনিকেতনে। আমার ঐ কবিতার একটি পদ কবি করুণানিধানের আশীষ-মন্ত্রে পূত হয়। এই রেখাচিত্রখানি কবি করুণানিধানের এত ভালো লাগে যে, তাঁর 'রবীন্দ্র-আরতি' বইতে কবিতার পুরোভাগে তিনি ঐ ছবিখানিকে স্থান দেন। ছবির নীচেয় লেখা দিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রশ্ন—'হে প্রসন্ন উদাসীন, কি দেখিছ সন্ধ্যার বাউল ?'

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ। কবি এ সময় কিছুকাল খড়দহে ছিলেন। সেখানে শারদীয়া পূজা-উৎসবের একটি অঙ্গ ছিল শিল্প ও কারুশিল্প প্রদর্শনী। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমার পূর্বাপর বৎসরের মতই যোগ ছিল। এবারে আমরা কবি করুণানিধানকে পেলাম উদ্বোধক ও সভাপতি রূপে। এ সময় মনোরম গঙ্গাতীর ও সবুজের সমারোহের মধ্যে খড়দহবাসীর সঙ্গে কবি কাব্যচর্চায় মগ্ন ছিলেন। একদিন এই পরিবেশে কবিকে বসিয়ে কবির একখানি পেন্সিল স্কেচ্ করি। এইটি প্রথম চিত্র। এতে তাঁর কিছু লেখা ও স্বাক্ষর আছে এবং তারিখ দিয়েছেন ২৯-৭-১৯৩৭।

২০-৪-১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ। কবি তখন বেলগাছিয়ায়। পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মতো আমি তাঁর কাছে গেলাম। এদিন আমার কাছে তিনি প্রায় দুঘণ্টা বসেন। এ দিন তাঁর দ্বিতীয় ছবিটা আঁকলাম। আঁকা শেষে ছবিতে স্বাক্ষর ও তারিখ দেন। আমার প্রতি স্নেহের আতিশয্যে তিনি ক্লান্তি অবসাদের অতীত অবস্থায় ছিলেন বলেই বিশ্বরূপ-মুগ্ধ, বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এবং আনন্দঘন মূর্তিতে চিত্রায়িত হন। আমাকে আশীর্বাদ ক'রে সানন্দে মিষ্টিমুখ করিয়ে সেই দিনটিকে আমার কাছে ও তাঁর অনুরাগীদের কাছে চিরমধুর ক'রে রাখলেন। কারণ একমাত্র এই ছবিখানিই রইল তাঁর অবর্তমানে আমাদের সকলের কাছে সুন্দরের সুষমামণ্ডিত সুমধুর রেখা-অবয়বে!

১৩৮১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫-৫-১৯৭৪) তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-ভবনে কবির একখানি আবক্ষ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানি ঐ রেখাচিত্র ও আমার স্মৃতিপটে-মূর্ত কবিমূর্তি থেকেই এঁকেছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-অবসানে, পাশ্চাত্য-শিল্পচর্চার জন্যে আমি যখন দীর্ঘকালের মতো ইউরোপ যাত্রা করি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে, তখন তাঁর আনন্দ ধরে না। সে সময় বিভিন্ন সূত্রে আমাদের সংবাদ আদান-প্রদান হয়। কিন্তু দেশে ফিরে শান্তিপুর পৌঁছানোর আগেই কবি শান্তিপুরে দেহরক্ষা করলেন, আমি তাঁকে হারালাম! হারালাম সেই দিব্য সঙ্গ। দীর্ঘ সঞ্চিত মনের কথা, মনেই রইল।

তাঁর কত কথাই মনে হয়। একদিন অনেকেই তাঁকে ঘিরে ব'সে আছেন। কি এক প্রসঙ্গে কবি একটি ইংরাজি কবিতার একটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেন—Home they brought her warrior dead! 'হোম' কথাটি আগে বসিয়ে ইংরাজ কবি দেখাতে চেয়েছেন জন্মভূমির স্বাধীনতা-রক্ষায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ বীরের নিষ্প্রাণ দেহখানিকে এবং তাঁর দেশবাসীরা ঐ বীরের জন্মভূমিতে এনেছিলেন—এটাই বড় কথা। এতে বীরের সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর দেশাত্মবোধ সমানভাবে দেখানো হয়েছে। হয়ত কবির এই ব্যাখ্যা হুবহু আমি বলতে পারলাম না।

মনে পড়ে কবিকণ্ঠের আবৃত্তি। উদারা-মুদারা-তারার সুরমণ্ডলে শব্দ-

ব্রহ্মকে আবাহন ক'রে, অনাহত ধ্বনিতে ভাবামূর্তির কি অপূর্ব কাব্য রূপায়ণ! যেমন বিচিত্রভাবের প্রাণসঞ্চার তেমনই বিচিত্রছন্দের গতিভঙ্গিমা। শ্রোতার হিয়াকে আকুল করানো সেকি যাদুমন্ত্র!

বিশ্বলীলামঞ্চে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের একমাত্র উৎসই যে সকলের লক্ষ্যবস্তু এবং অন্তিম-আশ্রয়; গতির নিবৃত্তি এবং অশান্তিতে শান্তিস্বরূপ, তাঁর অসংখ্য কবিতার মধ্যে একটি কবিতাংশে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন।

বজ্র ও যাঁর, বংশী ও তাঁর—বুঝিয়াছি এই শেষ-বেলায়;
'একাক্ষর' সে মন্ত্র জপিয়া তাঁরি পদে চিত শান্তি চায়।

এ যেন কাব্যরূপের প্রতীক শিল্প স্বস্তিক! কেন্দ্র-ব্যাসার্ধ-পরিধি—অভিমুখীর কেন্দ্র-অভিমুখী প্রত্যাবর্তন। দ্বৈতাদ্বৈত মিলন!

অথচ জীবনের প্রথম থেকে কি আকাশ বাতাস মাটি-জলে, কি উদ্ভিদ্-জন্তু-পাখি উভচরে, কি মানুষের জীবনে, শৈশব-যৌবন-বার্ধক্যের বিচিত্র প্রকাশে এবং কল্পনাজগতের অসীমতায় কবির কি অবিরাম পরিক্রমা। সকলকে নিয়ে চলেছেন। অহমিকার বিচ্ছিন্নতা নয়, নিরহঙ্কারের মহামিলন। জীবনধর্মী কাব্যসাধনায় মরজগতে দিব্য আলোকপাত।

অখণ্ড বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের সকল সংস্কৃতির মূলমন্ত্রটি যে একই, পূর্ণতার সাধনা—কবি করুণানিধানের কাব্য ভাণ্ডার তাই দিয়ে পূর্ণ।

আমরা বিশ্বাস করি, এই কাব্যপ্রীতি ও সাধনার নিসর্গদেশেই কবিতা অমর এবং কবিও অমর। তাই কবি করুণানিধানও আজ অমর।

সব শেষে আমার এই কবিতাতেই কবিকে আবার জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা—

তুমিময় কবিতার
সুধাপান অনিবার,
অনুরাগী-হৃদি-মন,
সেথা তুমি সুশোভন!
তব জন্ম শতবর্ষ
মন-প্রাণ ভরা হর্ষ,
গাহি তব জয়গান—
কবি করুণানিধান!

ভক্ত করুণানিধান

সমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

He stands awake in Supernature's light,
And sees a glory of arisen wings
And sees the vast descending might of God. [Savitri 623.

শ্রীঅরবিন্দের ভাবদৃষ্টি-পথে যে সত্যটির প্রকাশ হ'ল, তারই রূপায়ণ পাই মরমিয়া ভক্তকবি করুণানিধানের সাধনলব্ধ 'কাব্যস্তবকুসুমাঞ্জলি' সম্ভারে। সাধনশক্তি ও ভগবদ্‌কৃপাশক্তি যুগপৎ তাঁর চেতনার বিবর্তনে সহায়ক হয়ে তাঁকে করেছে সিদ্ধতপা ভক্ত, সাধক ও মরমিয়া কবি। কৃপাশক্তি সাধনশক্তির সহায় না হলে কোনো কর্মেই সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হয় না। কুলার্ণব তন্ত্রে জগদ্‌গুরু শিব দেবীকে বলছেন—

ভোগো যোগায়তে দেবি ! দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে,
মোক্ষয়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে কুলেশ্বরি !

ভোগ হয় যোগ, পাপকর্ম পুণ্যকর্মে রূপান্তরে সংসারযাত্রাও হয় মোক্ষদাত্রী কৃপাবরে। কৃপাশক্তি কবির সাধনশক্তিকে যেন পাখা দিয়েছিল কোনোও বাঁধনকে না মঞ্জুর করতে, অসৎ থেকে সদব্রহ্মে, তমসা থেকে জ্যোতির্নভে, মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করতে। 'পথে' কবিতায় তাঁর সাধনসাথী 'মর্মদোসর' জীবাত্মা। তাঁর যাত্রা 'পথ ফুরানর দেশে…রৌদ্র-ছায়ার শেষে।' 'মনরসনা' 'বন্তমধুর চাকের পঙ্কে বন্দী'। সেই পঙ্ক ভারে কবির 'চিত্ত-সারস অলসপক্ষ'। পঙ্ক-ভার মুক্ত হলে, 'মর্মদোসর' হবে 'মুক্তবাসরসাথী'। শুদ্ধ আত্মা 'মুক্তবাসর সাথী' চিত্ত-সারসকে সন্ধান দেবে পথফুরানর দেশে, অজানা দেবতার দেউলের জ্যোতির্নভে। জপ-সাধনা করে অর্থাৎ সাধনশক্তির সহায়ে এল কৃপাশক্তি, 'মর্মদোসর' হ'ল 'মুক্তবাসরসাথী', নিয়ে চলল চিত্তসারসকে 'অজানায়'। 'অজানাদেবতা' পরমাত্মা। আত্মা পরমাত্মায় চিদাকাশে হ'ল একাকার। 'মুক্তবাসরসাথী' কে, 'অজানা দেবতাই'-বা কে? কবির অনুভূতিগম্য ও জ্ঞানগম্য হচ্ছে না বলেই—প্রশ্ন করে উত্তর খুঁজছেন। চিত্ত-সারসকে নির্দেশ দিচ্ছে 'অজানা' দেবতার, যিনি আছেন 'পথ ফুরানর দেশে… রৌদ্রছায়ার শেষে'? 'রৌদ্র' বিদ্যাশক্তি, 'ছায়া' অবিদ্যাশক্তি অজানা দেবতার বিদ্যা ও অবিদ্যা. শক্তির পরপারে যে শক্তি—চণ্ডীতে তাকে 'যা সাবিদ্যা পরমামুক্তে' বলা হয়েছে। সেই 'সা' হ'ল 'অজানা দেবতা'। কবির ভাবটি কিরূপ নিল শ্রীঅরবিন্দের প্রোজ্জ্বল মরমিয়া দৃষ্টিতে? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

The unfelt self is here our guide,
The unknown self above is our goal. [Savitri

জীবাত্মা—আসিক, প্রেমিকা। পরমাত্মা—মাসুক, প্রেমাস্পদ। কবি দীক্ষা নিয়েছেন সেই মন্ত্রে যাকে বলছেন 'থঞ্জনেরি ডাকে'। সেই ডাক—প্রেমের। প্রেমের ডাকে 'আসিক' ও 'মাসুক' মহামিলনে হয় একক সত্তা আনন্দলোকে—অমৃতলোকে। a companionless reality—বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। পথ ফুরানর দেশে যেখানে অজানা দেবতা সেখানে না আছে আত্মা, না পরমাত্মা—না 'আসিক', না 'মাসুক'—শুধু 'অক্ষয় সুখ রূপাতীত রূপ ও রসের উৎস'—'লোকান্তরে', চিদাকাশে 'পথ ফুরানর দেশে…রৌদ্র-ছায়ার শেষে।' কবি বলছেন—

উড়তে চাহে চিত্ত-সারস পক্ষভারে পক্ষ অলস
কোন অজানায় জপ-সাধনায় খুঁজব দেবতাকে ?
কে আজি মোর দোসর হবে পথ-ফুরানর দেশে ?
রিক্ত করে সঙ্গ নেবে রৌদ্র-ছায়ার শেষে ?

'পথে' কবিতাটিতে আত্মা ও পরমাত্মার মহামিলন হ'ল 'চিদাকাশে', কবির অতিমানস চৈতন্যলোকে। কবি বলছেন—

আমার আঁখির বাষ্প মেখে পুষ্প-শোভা উঠ্‌বে জেগে,
তরল-তর-রত্নহার গাঁথবে অনিমেষে।

কবিতাটির গভীরে যে রূপরসোত্তীর্ণ শক্তির লীলাবৈচিত্র্যের সংবাদাভাস পাওয়া যায় তা শুধু মরমিয়া ভক্তের চিদাকাশে প্রত্যক্ষ অনুভূতি যার রহস্যজালাবরণ শ্রীঅরবিন্দের যোগ-প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে কিছুটা অপসৃত হ'ল—

Here in this chamber of flame and light they met ;
They looked upon each other, knew themselves,…
The calm immortal and the strrugling soul.
Then with a magic transformaton's speed
They rushed into each other and grew one. [Savitri 527

'জীবাত্মা'—'আসিক'—প্রেমিকা যখন 'মুক্তবাসরসাথী' তখন সে Struggling soul. পরমাত্মা—'মাসুক'—প্রেমাস্পদ—The calm immortal। পরস্পর জানল তারাকে, হয়ে গেল এক। Transformation's speed—রূপান্তর শক্তি কিন্তু 'magic'—রহস্যময়ী—মরমিয়া—অনির্বচনীয়া, তন্ত্রে সেই শক্তিকে বলে প্রেমানন্দ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন 'Bliss', যার গতি রূপব্রহ্মে, রসব্রহ্মে ও রূপরসোত্তীর্ণ অনির্বচনীয় অমৃতময় আনন্দময় ও প্রেমময় লোকে—Bliss of a myriads, myriads are but one বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

'পথে' চলেছেন অজানায় জপ-সাধনায় খুঁজতে দেবতাকে। 'পথ ফুরানর দেশে' ও 'পথে' চলতে চলতে কবি প্রত্যক্ষ করলেন—'চিরসুন্দর'—

জগৎপ্রাণ—ভূমানন্দ, সবার সেরা বন্ধুকে। 'পথে' যিনি অজানা দেবতা, 'চিরসুন্দর' কবিতাটিতে তিনিই হলেন ভূমানন্দ—জগৎ-প্রাণ—চিরসুন্দর। কবির চিত্ত-সারস ভূমানন্দরসপিয়াসী। সেই রসের উৎস ও উপাদানে জগৎপ্রাণ—ভূমানন্দ—যার সৌরভে হৃদগগনে—দহরাকাশে—চিদাকাশে পবন অর্থাৎ জীবাত্মার গতি হয় মন্থর—জীবাত্মা শান্ত হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন—In absolute silence lies the Absolute power.

Absolute power হ'ল 'জগৎপ্রাণ'-যার প্রকাশ রূপব্রহ্মে, রসব্রহ্মে ও রূপরসোত্তীর্ণ অমৃতব্রহ্মে। 'চিরসুন্দর' হলেন 'ভূমানন্দ'—জগৎপ্রাণ। তাঁকে পেতে চান কবি। পাওয়ার জন্যে প্রার্থনায় কি বলছেন —

সকল স্মৃতি দাও ঘুচায়ে, থাকুক শুধু এক স্মৃতি,
জীবন থেকে দাও গো মুছে ভক্তিহীনের দুষ্কৃতি।
...
মুহূর্তেরি প্রমাদ-বশে যদিই তোমায় বিস্মরি,
ঘুচিয়ে দিয়ো, বিনাশিয়ো অবিশ্বাসের শর্বরী।

ভক্তি ও বিশ্বাসকে ভিত্তি করে সাধনপথের লক্ষ্যে চলেছেন কবি—প্রত্যক্ষ করলেন যাঁকে তিনি জগৎপ্রাণ—'জলে স্থলে সূক্ষ্মে স্থূলে শাশ্বত তাঁর সিংহাসন।' সাধনপথের কোন স্তরে এসে চিরসুন্দর জগৎপ্রাণকে চিনতে পারলেন—চিন্ময়লোকে জ্যোতির্নভে। 'বিশ্ব হয়ে শরীরম' এই উপলব্ধি কবির হ'ল। বিশ্ব যে 'হয়ে শরীরম' (শ্রীমদভাগবত বাণী), শ্রীশ্রীচণ্ডীও তাই বলেন—'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ ব্যাপ্যস্থিতাজগৎ'।

শ্রীশ্রীচণ্ডী বলেন—চেতনেত্যভিধীয়তে—চৈতন্যলোকেই জগৎপ্রাণ, মহাবিশ্ব কুণ্ডলিনী-উপলব্ধব্য। কবি বলছেন —

কুসুম-হারে সূতার সম লুকিয়ে আছে অপ্রমাণ
পাপড়ি কবে পড়বে খসে ? চিনব তোমায় জগৎপ্রাণ !

'চিরসুন্দর' অপ্রতর্ক্য বলেই, 'অপ্রকাশ ও অপ্রমাণ' কিন্তু চিৎস্বরূপ বলেই তিনি ভূমানন্দ। আনন্দই হ'ল প্রাণের উৎস ও উপাদান।

চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, নিত্য বলেই বিশ্ব 'হয়ে শরীরম' অর্থাৎ জগৎ প্রাণ, মহাবিশ্বকুণ্ডলিনী, যার ব্যাপ্তি ওতঃপ্রোতভাবে রূপব্রহ্মে ও রূপরসোত্তীর্ণ অমৃতব্রহ্মে। সাধকের আত্মচৈতন্যে বিশ্ব যখন চৈতন্যময়ীশক্তির লীলাক্ষেত্র বলে অনুভূত হবে, তখন সাধকের 'পাপড়ি খসে' পড়বে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাই 'বিশ্বাত্মিকা ধারয়সতি বিশ্বম' বিশ্বপ্রাণ নারায়ণীকে, যখন দেবতাদের 'পাপড়ি' খসে পড়েছিল।

'পাপড়ি কবে পড়বে খসে'—মানে যখন সাধন সৌকার্যে সাধকের আত্মা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, মোহ ও অভিনিবেশ মুক্ত হয়ে হবে 'মুক্তবাসরসাথী'।

অবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যাশক্তি দ্বারা স্তিমিত হয়। অবিদ্যাদি-মুক্তসাধকের আত্মা দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। দিব্য বা চিন্ময় দৃষ্টি সহায়ে সাধক 'চিরসুন্দর' 'ভূমানন্দ'—জগৎপ্রাণকে চিন্ময়লোকে করেন প্রত্যক্ষ। চিন্ময়লোক, চিদাকাশ, জ্যোতির্গর্ভ হ'ল সাধকের শুদ্ধবিদ্যালোক যেখানে জগৎপ্রাণ জ্যোতিঃস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ। শুদ্ধবিদ্যালোকে সাধকের আত্মজ্যোতিভাস্বর, শুদ্ধাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার মোহমুক্ত অবস্থা। 'পাপড়ি' খসলে হয় জীবাত্মার মোহাবরণ অপসৃত। তখন আত্মার স্বরূপাবস্থান আত্মজ্যোতিতে বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে। আত্মজ্যোতিতে সাধক জ্যোতিঃস্বরূপের সাক্ষাৎ পায় বিশ্বরূপে। 'পাপড়ি কবে পড়বে খসে' অবস্থায় সাধকের আত্মচৈতন্যের সেই শুভ্র বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে, যেখানে 'তজ্জ্যোতিঃ জ্যোতিষামহম্' প্রত্যক্ষ হয়। সাধকের ঐ প্রত্যক্ষানুভূতির রহস্যলোকে শক্তির যে লীলাবিলাস, শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে তার রসাভাস পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন —

The soul lit the Conscious body with its ray,

Matter and spirit mingled and are one.

Matter—পাপড়ি, spirit 'অপ্রমাণ'— জগৎপ্রাণ চিরসুন্দর।

Matter বা Natureকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন power of spirit, spirit force। power ই হ'ল 'তজ্জ্যোতিঃ জ্যোতিষামহম'। 'পাপড়ি খসা' জীবাত্মা যখন অবিদ্যা-মায়াশক্তি হতে মুক্ত হ'ল, বিদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রভাবে রূপ-রসোত্তীর্ণ ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্যলোকে সাধকের হ'ল জগৎপ্রাণের সঙ্গে একাত্মানুভূতি যা 'শকুন্তভাষণে' প্রকাশের প্রয়াস করলেও রয়ে যায় অপ্রকাশ, অপ্রমাণ ও অনির্বচনীয়। মরমিয়াবাদী ভক্তের অনুভববেদ্য এই প্রত্যক্ষদর্শন তখনই সম্ভব যখন 'পাপড়ি কবে পড়বে খসে'। ঐ অনুভববেদ্যপ্রত্যক্ষ-জগৎপ্রাণ-দর্শন সম্বন্ধে রহস্যবাদী Choung-tze বলছেন—The mystical experience can be enjoyed only when the desires of the soul are liberated, simplified above reason.

[Divine Universe 263 Spalding

'চিরসুন্দর' অঙ্কাতীত বলে 'অপ্রমাণ'। কিন্তু মরমিয়াভক্তের জাগ্রত-চৈতন্যলোকে চিরসুন্দর যখন জগৎপ্রাণসত্তায় চিৎস্বরূপে অনুভববেদ্য, তখন তার প্রাণস্পন্দনে জগৎপ্রাণস্পন্দনের অনুরণন চলে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন— All live in him, He lives by none। 'পাপড়ি' খসলে, ভক্তপ্রাণে জগৎপ্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। আত্মা বা প্রাণ সংস্কারমুক্ত হলে জগৎপ্রাণ ছন্দের স্পন্দনে স্পন্দায়িত হবে। শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারাপথের অনুসরণ করলে, কবি করুণানিধানের 'চিনব তোমায় জগৎপ্রাণ' বাণীটির মর্ম হয়ত অনুধাবন করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন —

In the enormous emptiness of thy mind
Thou shalt see the Eternal's body in the world,
Know him in every voice heard by thy soul :
In the world's contacts meet his single touch ;
All things shall fold thee into his emprace,
Conquer thy heart's throbs let thy heart beat in God.
[Savitri 476

'পাপড়ি কবে'—কথা দুটির মধ্যে কবি সাধনসিদ্ধ বিশেষ স্তরে—তুরীয়ে ও তুরীয়াতীতে আত্মার স্থিতি নির্দেশ করছেন।

তন্ত্রের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'-মন্ত্রটির গূঢ়রহস্য ও তাত্ত্বিক উপলব্ধিপ্রসূত ভাবটির মর্মবাণী প্রকাশ করলেন কবি একটি চরণে —'পাপড়ি কবে পড়বে খসে চিনব তোমায় জগৎপ্রাণ।' যেমন করলেন শ্রীঅরবিন্দ একটি লাইনে—Conquer thy heart's throbs let thy heart beat in God.

'প্রাণপ্রতিষ্ঠার' জন্য তন্ত্র যে সব প্রক্রিয়ার বিধান দিয়েছেন, তার মধ্যে অতি দুরূহ প্রক্রিয়া হ'ল কুণ্ডলিনী জাগরণ। 'পাপড়ি কবে পড়বে খসে'—তন্ত্রালোকে বিবেচনা করলে, সাধকের 'জাগ্রত কুণ্ডলিনী' নির্দেশ করছেন, মরমিয়া ভক্তসাধক কবি। তাঁর জাগ্রত-চৈতন্যলোকে চিরসুন্দর জগৎপ্রাণ ভূমানন্দ অনুভববেদ্য প্রত্যক্ষ সত্য যা সাধারণ পাঠকের ধারণাতীত। মরমিয়া ভক্তসাধকেরজাগ্রত-চৈতন্যলোকে যে দিব্যানুভূতি শুধু অনুভূতি নয়, প্রত্যক্ষ দর্শন—(দর্শন জ্ঞানার্থে)—নিত্যচিদানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে তার সন্ধান পাই। শ্রীঅরবিন্দ বলেন—The mystic feels real and present, even ever-present to his experience, intimate to his being, truths which to the ordinary reader are intellectual abstractions or metaphysical speculations. [Savitri-Letters 735

ভক্তের চিদাকাশে চিদাত্মস্বরূপই জগৎপ্রাণ-চিৎশক্তি, সদ্রূপা ও আনন্দরূপা। জীবাত্মা মোহময় মায়িক জগতের রূপ-রসের শতদল শোভিত অসদ্রূপা ও নিরানন্দরূপা। শতদলের 'পাপ্‌ড়িগুলি খসে' পড়লে 'মর্মদোসর' জীবাত্মা হ'ল 'মুক্তবাসরসাথী'। 'মুক্তবাসরসাথী' শুদ্ধাত্মাশক্তি মহামায়ার কোন রহস্যলীলা বিলাসের সংঘটনে চিদাত্মস্বরূপে জগৎপ্রাণ সত্তায় সামরস্যে হয় একাকার সেই লীলাময়ীশক্তির করুণা চাইছেন সাধকভক্ত করুণানিধান—

দীপ্ত তাঁহার নয়ন মণি কে গণে তার সংখ্যা নাই!
রাত্রি-দিবা যুক্ত করে করুণা তার চাই গো চাই।

শিব তন্ত্রে মহামায়ার কৃপাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। সাধনশক্তি ও কৃপাশক্তি যখন সাধকের সহায়, সিদ্ধি তখন তার করতল—বলছেন কুলার্ণব,

মহানির্বাণ ও যোগিনীহৃদয় তন্ত্র। সাধনশক্তির মূল উৎস ভক্তের বিশ্বাস ও ভক্তি যা কবি বারে বারে দৃঢ় হস্তে ধরে সাধনপথে হয়েছেন ঊর্ধ্বগামী। কারণ তাঁর এই প্রতীতি তিনি তাঁর বহু কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। ঐকান্তিক বিশ্বাস ও অহৈতুকী ভক্তি সাধকের সাধনপথে কৃপাশক্তিকে করে আকর্ষণ। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—The two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavour, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a Supreme Grace from above answers.

[The Mother I

ভক্তি ও বিশ্বাসের শক্তি পাপড়ি খসাতে বিশেষ সাহায্য করে কারণ ঐ শক্তি আকর্ষণ করে মহাকৃপাশক্তিকে। সাধনশক্তি ও কৃপাশক্তি মর্মদোসরকে পাপড়ির আবরণ হতে মুক্ত করলেই, 'রিক্ত মর্মবাসরসাথী'– শুদ্ধাত্মা চিনবে জগৎপ্রাণ-চিরসুন্দরকে। কবির অনুরূপ উক্তি—'পাপড়িখসা' পাই, শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে—But the Supreme Grace will act only in the conditions of Light and Truth. [The Mother—I

জীবাত্মার পাপড়ি খসা অবস্থা হ'ল—conditions of Light and Truth। কবি বলেছেন —'কুসুমহারে সুতার সম লুকিয়ে আছে অপ্রমাণ,

পাপ্‌ড়ি কবে পড়বে খসে? চিনব তোমায় জগৎপ্রাণ।' [চিরসুন্দর

শ্রীভগবান ভক্তি ও বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর কৃপাশক্তির লীলাবিলাসের কথা বল্‌ছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম। [শ্রীগীতা ১৮ অধ্যায় ৫৫ শ্লোক

শ্রীভগবানের উক্তিটি কবির উপরোক্ত উক্তিটির রহস্য উদঘাটন ক'রল। শ্রীভগবান বলেছেন—আমি যে প্রকার এবং আমার যথার্থ স্বরূপ যা তা তত্ত্বের সঙ্গে পরাভক্তির দ্বারা আমার ভক্ত সম্পূর্ণরূপে আমাকে জানতে পারে। পাপড়িগুলি তত্ত্বের আবরণ। জগৎপ্রাণকে তত্ত্বের সহায়ে জানতে হলে তত্ত্বের আবরণ অপসারণ প্রয়োজন। স্বরূপতঃ জগৎপ্রাণকে জানতে হলে ভক্তের স্বরূপের আবরণ-উন্মোচন বা 'পাপড়ি খসানো' অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, মোহ ও অভিনিবেশ সাধনসৌকার্যে লয় করানো। ভগবদ্‌স্বরূপের আবরণ বিদ্যা। উভয় আবরণ উন্মোচন কল্পে প্রয়োজন বিশ্বাস ও ভক্তিভিত্তিক সাধনা। প্রথম আবরণ উন্মোচিত হলে, জীবতত্ত্বের স্বরূপ ঈশ্বর ও ঈশ্বর-স্বরূপের আবরণ অপসৃত হলে ভক্তের দহরাকাশে কৃপাশক্তির সহায়ে যাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, তিনিই ঈশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী একাকারে। দুয়ে এক, যে একের আর দুই নেই—শুধু অখণ্ড ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী নিত্যমুক্তপরাৎপরা মহাশক্তি, যিনি জগৎপ্রাণ।

কবির তপস্যাপ্রসূত কাব্যস্তবকুসুমাঞ্জলি মা বীণাপাণির চরণে নিবেদন কালে কবি বলেছেন—

প্রসীদ, বরদে, পরসাদ-রেণু দাও মা বাণী
মার্জনা কর অপরাধ মম এ আরাধনে,
এসো গো জননি, এসো সেবকের হৃদয়াসনে। [বন্দনা

কবি দেবী বীণাপাণির বন্দনা কালে প্রথমে ভিক্ষা চাইলেন—

স্বচ্ছ বিশদ, উজ্জ্বল ভাষা দাও মা দাসে,
গাঁথিব পুণ্য বাণীর মাণিক ললিত ভাষে।

'গাঁথিব পুণ্য বাণীর মানিক ললিত ভাষে'—এই প্রার্থনা পার্থিব যশ মান পাবার বাসনা প্রসূত মনে করে, তাঁর 'বাণীকুসুমরাজি'-ভরা অঞ্জলিদানের মধ্যে 'অপরাধবোধ' জাগল। কবি আহ্বান করলেন তুষারকুন্দভূষণা শক্তি কুণ্ডলিনীকে যাঁর অপর নাম শব্দব্রহ্ম তাঁর হৃদকমলে অর্থাৎ অনাহত পদ্মে যেখানে জীবাত্মা—'হংস-অনিল-বিনা—দীপকলৈকা-হংসেনসংশোভিতা'। বাণী-ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী অনাহত পদ্মে জাগ্রতা হলে, তাঁর গতি বিশুদ্ধপদ্মে ও আজ্ঞাচক্রে অব্যাহত। সাধকের অনাহত পদ্মে বাণী-ব্রহ্মশক্তিরূপা কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে, করেন সাধককে 'বাচমিশ্বর'—তত্ত্বজ্ঞানী, কবিক্রান্তদর্শী। ['ষট্‌চক্র নিরূপণ' পূর্ণানন্দস্বামী-২৬ শ্লোক] কবির চরম প্রার্থনায় তিনি দেবীর কাছে আত্মবোধন ভিক্ষা করলেন। তাঁর সাধনার যেটুকু আভাস পাওয়া যায় তাঁর 'কাব্যশ্লোকস্রোতের' ধারা পথ অনুসন্ধান করলে, তা থেকে যে তত্ত্ব উপলব্ধব্য, শ্রীঅরবিন্দের ভাবদৃষ্টিতে তার প্রকাশের রূপটি হ'ল—

His is a search of darkness for the light,
Of the mortal life for immortality. [Savitri 71

কবির কাব্যশ্লোকস্রোতের ধারাপথ, ভগবদানুরাগ-প্রসূত প্রেমভক্তির রসমাধুর্য সিঞ্চিত হয়ে অব্যাহত গতিতে রূপব্রহ্মে, রসব্রহ্মে ও রূপরসোত্তীর্ণ অমৃতলোকে হয়েছে ঊর্ধগামী। তাঁর ঐকান্তিক দিব্যানুরক্তির ভাবমাধুর্য প্রকাশের বাহন করেছিলেন 'স্বচ্ছ বিশদ উজ্জ্বল ভাষে'। শব্দচয়নে, শব্দ-বিন্যাসে ছন্দশৈলীতে ও ভাববৈচিত্র্যের চিত্রণ সুষমাতে কবির রূপদৃষ্টির ও রসসৃষ্টির 'বিশ্ববিনোদন' দিব্য আবেদন লক্ষণীয়। যে শক্তি কবির কাব্য-লোকান্তরচারিণী—'মানসবনের-অপ্সরী' তার অখণ্ড পরিব্যাপ্তি কবির চিৎ-সাম্রাজ্যে চিত্তাকাশে ও চিদাকাশে। 'মোহিনী' রূপে কবির চিৎসাম্রাজ্যে সেই শক্তি করেছে তাঁকে 'তন্দ্রাতুর', নিয়ে চলেছে কবিকে সীমার পারে, সীমার অন্তপারেও প্রশ্ন করেছে—'কোথায় যাবে কোন প্রবাসে আশার অবসানে ?'

[মোহিনী

'মানসবনের-অপ্সরী' শব্দভ্রমর গুঞ্জরণের ধারাপথে ঝরে পড়ল 'গানের মধু'

হয়ে। রূপব্রহ্ম কবির চিৎসাম্রাজ্যে, রসব্রহ্ম তাঁর চিত্তাকাশে। কিন্তু কবির চিদাকাশে মানসবনের-অপ্সরী—'হাওয়ায় ভেসে কোথায় সে যে লুকিয়েছে।'

[মনোহারিকা

কবির চৈতন্যের তিনস্তরে শক্তির লীলা—চিৎসাম্রাজ্যে, চিত্তাকাশে ও চিদাকাশে—'মোহিনী', 'মনোহারিকা' ও 'হাওয়ায় ভেসে কোথায় সে যে লুকিয়েছে'। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে শক্তির ত্রিপথগা ভাবধারা হ'ল—

Individual, Universal and Transcendental.

কবি ব্যষ্টিমানসে, সমষ্টিমানসে ও অতিমানসে শক্তির লীলাবৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করেছেন—'মোহিনী' ও 'মনোহারিকা' কবিতা দুটিতে।

কবির প্রতীকোপম কয়েকটি কবিতা আলোচনা করলে, কবিমানসের তিন-স্তরে শক্তির লীলাবৈচিত্র্যের রসাভাস পাওয়া যেতে পারে বলে আমার মনে হয়।

'পদ্মাতটে' এসে পড়েছেন কবি। তাঁর 'মানসকানন' হঠাৎ হ'ল মসী-লিপ্ত। সম্মুখে 'আঁধারে বিধূর মাঠ ধু ধু করে'। কপিশ আকাশ স্তব্ধ উদাসীন। দূরে কে যেন ঐ পরিবেশে নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে!

প্রবল ঝড় উঠল, দূর হ'ল কবির মনের তামসমসী। স্তব্ধ-প্রকৃতির উদাসীন ঠাটটি গেল ভেঙ্গে। কবির মানসকাননের তিনটি স্তরে অনুভূত হ'ল—

ঘর্ঘর ঘোষ বজ্রস্তনিতে লহরিয়া উঠে সকল শোণিতে—
হেরিনু মুরতি ভীতিভঞ্জন কণ্ঠে দোদুল হরিচন্দন
পরাগের ধূম উড়ায়ে।

[পদ্মা-তটে

শক্তি তন্ত্রমতে মায়া—বিদ্যা মায়া বা শক্তি, অবিদ্যা মায়া বা শক্তি। বিদ্যা ও অবিদ্যার পরপারে শক্তির অমৃত উৎস। আত্মায় ওতঃপ্রোতভাবে আছে বিদ্যা ও অবিদ্যাশক্তি দেহাধারে। বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়াকে স্তিমিত করে—বিদ্যামায়া লয়াত্মিকা, অবিদ্যামায়া সৃষ্ট্যাত্মিকা। বিদ্যা অবিদ্যার উৎসে যে শক্তি, সেই মহামায়া। মায়াশক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে মহামায়া অখণ্ড শক্তি পরাচৈতন্যময়ী আদ্যাশক্তি। শক্তি মহামায়া বিদ্যাশক্তির দ্বারা স্বীয় অবিদ্যাশক্তিকে লয় করে, আত্মার মহামায়ালোকে—সাবিত্রীলোকে—পরাচৈতন্য লোকে উত্তরণ সম্ভাব্যের সংবাদটি, কবি 'পদ্মাতটে' তাঁর প্রত্যক্ষানুভূতিলব্ধ সত্যটিকে রূপ দিয়েছেন। শক্তিতত্ত্বের রহস্যাবরণ 'পদ্মাতটে' কবির মানসকাননে হ'ল অপস্রিয়মান। শ্রীঅরবিন্দ শাক্তিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তির জালাবরণ রহস্য উন্মোচন করে বলছেন—

A power on him from her occult force
That ties him to his creatune's fate,
And never can the mighty traveller rest
And never can the mystic voyage cease

Till the nescient dust is lifted from man's soul
And morns of God has overtaken his night. [Savitri

Mighty traveller—আত্মা ; mystic voyage—পদ্মাতট, nescient dust—'ধু ধু করে বিধুর মাঠ', morns of God—কণ্ঠে দোদুল হরিচন্দন his night—মসীলিপ্ত মানসকানন।

'বজ্রও যাঁর বংশীও তাঁর' (উদ্দেশে) ও 'ঘর্ঘর ঘোষ বজ্র স্তনিত'এর মধ্যে 'ভীতিভঞ্জন কণ্ঠে যাঁহার হরিচন্দন।' এই অনুভূতি কবিমানসকাননে বারে বারে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, দুঃখের মাধুরীতে তাঁকে দিশাহারা করেছে, নিয়ে চলেছে অকূলের কূলে আনন্দময়-অমৃতময়লোকে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

Annulled the sorrow of the ignorant depths ;
Suffering was lost in her immortal smile. [Savitri 314

'পদ্মাতটে' কবিতাটিতে 'mystic voyage'কে রূপদান করবার প্রয়াসে কবি সফলকাম বলে মনে করি।

'সন্ধ্যালক্ষীর প্রতি' ও 'উষা' কবিতা দুটিতে কবি ঋক বেদোক্ত 'রাত্রি সূক্ত'এর বা 'শক্তিসূক্ত'এর মর্মবাণী অপূর্ব ভাব ও ভাষায় ছন্দায়িত করেছেন। 'রাত্রি' শব্দের অর্থ শক্তি—'কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চ দারুণা'—বললেন শ্রীশ্রীচণ্ডী। নানা নামের সার্থক নামাবলী দিয়ে কবি সন্ধ্যালক্ষ্মীকে (লক্ষ্মী অর্থে শ্রী বা শক্তি) সাজিয়েছেন—'নয়নগরবী' 'মানস-নন্দিনী' 'মানস-দুলালী' 'অমরীবালা'। রাত্রি দেবীকে কবি নিজের 'খেলাঘরে' আহ্বান করছেন, তাঁর লীলাবৈচিত্র্যের রসাস্বাদন মানসে। সন্ধ্যালক্ষ্মী বা রাত্রিশক্তিকে কবি বলছেন—

তোমার রঙের ইন্দ্রজালে দাও গো নয়ন ভরে
দুহার আলো সব ভুলালো লো অমরীবালা
এস, এস চঞ্চলিয়া চুলের তারার মালা।

রাত্রিসূক্ত—রাত্রিবন্দনা ও 'সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি' বা সন্ধ্যাবন্দনা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। রাত্রিসূক্ত বলেন যে রাত্রি ও উষা পরমাত্মার মানস-কন্যাদয়। শক্তির পরাসত্তা হতে রাত্রি ও উষার সৃষ্টি। জন্মের শেষে মৃত্যুর প্রারম্ভ, রূপ নিল সন্ধ্যায়, মৃত্যুর অবসানে জন্মের প্রারম্ভ, রূপ নিল উষায়। শক্তিচক্র শক্তির বা রাত্রির ঐ লীলাকে 'রাত্রিসূক্ত'এ বন্দিত হয়েছে। কবি ঐ তত্ত্বটিকে দুটি কবিতায় রূপায়িত ও ছন্দায়িত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ রাত্রিশক্তিকে বলছেন—Unlit temple of eternity, উষাকে বলছেন—

A glamour from the unreached transcendences
Iridescent with the glory of the Unseen,
A message from the unknown immortal Light. [Savitri 3-4

Unlit temple of eternity হতে the unknown immortal Light অর্থাৎ রাত্রি ও উষার অন্তরালে একই শক্তির অনাদি ও অনন্ত অমৃতধারা বইছে শ্রীঅরবিন্দের যোগানুভূত দৃষ্টিপথে। রাত্রিসূক্তে যে সত্যটির প্রকাশ, তারই অনুরূপ ভাবটি কবি দুটি কবিতাতে –'সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি' ও 'উষা'তে প্রকাশ করছেন।

রাত্রিশক্তি তার চক্ষুস্থানীয় মহদাদি-তত্ত্ব দ্বারা সর্বস্তর প্রকাশ করলেন। [রাত্রিসূক্ত—দেবক্ষভিঃ] কবি তাই রাত্রিকে 'নয়নগরবী' বলছেন। 'নয়ন' এখানে 'spiritual eyes' বোঝাচ্ছে। ব্রহ্মচৈতন্যকে বলা হ'ল দেবক্ষভিঃ, অর্থাৎ নয়নগরবী। রাত্রিশক্তি অমর্ত্যা-[রাত্রিসূক্ত], কবি বলছেন—'অমরীবালা'। মরণরহিতা অমর্ত্যা রাত্রিশক্তি দেবনশীলা জগৎকারণভূতা মহামায়া। [ওর্বপ্রা অমর্ত্যা—রাত্রিসূক্ত] রাত্রি পরমাত্মার মানসকন্যা, কবির মানস-দুলালী, মানস-নন্দিনী। মানস-নন্দিনী কেন? রাত্রিসূক্ত বলেন —'জ্যোতিষাবাধতে তমঃ'। রাত্রিসূক্ত আরও বলেন –'নিবতো দেব্যুদ্বত' —বিশ্বের আনন্দদায়িনী শক্তি রাত্রি বিশ্বপ্রপঞ্চে ও প্রপঞ্চগত যা কিছু সৃষ্টবস্তুর অন্তরে যেমন প্রকাশিত, জীবচৈতন্যলোকেও তেমনি। মানস-নন্দিনী ব্রহ্মচৈতন্য উচ্চাবচ নিখিল প্রপঞ্চের অবভাসক হলেও শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মকারা চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত হলে, সাধকের অবিদ্যা—অর্থাৎ তিমিরান্ধকার নাশ করে। ব্রহ্মচৈতন্যময়ী রাত্রিশক্তিকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন Heavenly Psyche। ব্রহ্মকারা চিত্তবৃত্তির দ্যোতক সন্ধ্যালক্ষ্মী—লক্ষ্মী বা শ্রী শব্দে শক্তিকে বোঝায়। কবির সাধনশক্তি তাঁর মানস-নন্দিনী। রাত্রিসূক্তরাত্রিশক্তিকে 'অপেদু হাসতে তমঃ—শক্তির বিদ্যারূপিণী—তামসনাশিনী ও চৈতন্য-উন্মেষণী রূপটি প্রকাশ করছেন। কবিও বলছেন—'তোমার রঙের ইন্দ্রজালে দাও গো নয়ন ভরে।'

রাত্রিসূক্তের একটি মন্ত্রে পাওয়া যায় যে রাত্রিশক্তি ভগিনী উষার নৈশতম গ্রহনক্ষত্রাদি রূপে স্বীয় তেজে অপসারিত করেন। কবি বলছেন—

তুহার আলো সব ভুলাল ও অমরীবালা।

রাত্রিসূক্তে অপর একটি সূক্তে বলছেন যে ব্রহ্মচৈতন্যময়ী আনন্দরূপা রাত্রিশক্তি স্বীয় অবিদ্যার আবরণী শক্তিকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ করেন বলেই অন্ধকারনাশিনী নিত্যমুক্তাপরাৎপরা অখণ্ড ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী জননী মহামায়া। মহামায়া মহাঘোরা মায়াশক্তিকে নির্দেশ করেন না। বন্ধন বিমুক্তির পরমকারণ মহামায়া, বন্ধনেরও তিনি অধীশ্বরী।

স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী বলেন—

'কিংমায়া মহতীতি বক্তুমুচিৎম মায়াঽপি যৎকিঙ্করী?
মায়াঘোরা মায়া, কে বলিবে তোমা? মায়া যেবা তোমার কিঙ্করী?'

[বিচিত্রা শ্লোক মঞ্জরী-১১৫

'অমরী বালা' রাত্রিশক্তিকে কবি বলছেন —

এস, এস চঞ্চলিয়া চুলের তারার মালা। [সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি

অন্ধকারতীত শক্তির প্রতীক চুল, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণা বলে মায়াশক্তির পরিচায়ক। মায়াশক্তি অবিদ্যা, বিদ্যাশক্তির প্রতীক গ্রহনক্ষত্রাদি। বিদ্যাশক্তি অবিদ্যা শক্তিকে লয় করে শক্তির উৎসে। ব্রহ্মশক্তির দুইরূপ—বিদ্যাশক্তি মহামায়া, অবিদ্যাশক্তি অবিদ্যামায়া। মায়াশব্দ তন্ত্রে শক্তি কে বোঝায়। শক্তিতে পরস্পর বিরোধী রূপের—বিদ্যা ও অবিদ্যার সহসংস্থান—ব্রহ্ম বস্তুর স্বধর্মের পরিচায়ক।

'চুলের তারার মালা' শব্দগুলির বাচ্যার্থ শাস্ত্রমতে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যা মায়ার সহসংস্থান নির্দেশক শক্তি মহামায়ার স্বরূপ ব্যক্ত করা হচ্ছে। সন্ধ্যা-লক্ষ্মীর প্রতি' ও 'উষা' কবিতা দুটিতে বেদাগম অনস্যূত শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য কবি প্রকাশ ক'রছেন। উষাকে কবি বলছেন—'আলোক-সম্ভবে' 'প্রমা' ধ্রুবালোক 'বিধাতার অতুলনা মানস-দুহিতা' 'সবিতার নর্ম-সখী'। এইপ্রসঙ্গে সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

প্রমা—'আধ্যাত্মিক সম্পদ' বা উত্তমশ্রী - Supreme Power

'শ্রী' শব্দ শক্তিকে নির্দেশ করে। 'আলোক-সম্ভবে' কথা দুটির অর্থ পাই—শ্রীঅরবিন্দের 'Symbol Dawn' শীর্ষক কবিতায় (Savitri—'The priscience of a marvellous birth to come'। 'আলোক সম্ভবে'—'উষা'—দিব্যজীবনে উত্তরণ সম্ভাব্যের সূচনা ক'রে! প্রমা সেই শক্তি সম্পদ যার বলে ব্রহ্মচৈতন্যের উন্মেষ লাভ সম্ভব হয়। 'ধ্রুবালোক'—শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে 'Unreached Transcendences'। প্রমা অর্থাৎ পরাশক্তি মহামায়াকে কবি আহ্বান করছেন—'এস উষা, এস প্রমা, এস ধ্রুবালোক।' কি জন্যে? কবি বলছেন—'পৃথিবীর পরমাণু প্রকম্পিত হোক!' [উষা

শ্রীঅরবিন্দ কবির উপরোক্ত ভাবটি একটু বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন —

Once more the rumour of the speed of Life
Pursued the cycles of her blinded quest.
All sprang to their unvarying daily acts ;
The thousand peoples of the soil and tree
Obeyed the unforeseeing instant's urge,
And leader here with his uncertain mind,
Alone who stares at the future's covered face,
Man lifted up the burden of his fate. [Savitri 6

ব্রহ্মশক্তির অঙ্গাঙ্গী সহাবস্থান ও অভেদত্ব রূপরসোত্তীর্ণ অব্যক্ত চিন্ময়লোকে অনুভূতি সাপেক্ষ বলে শাস্ত্রে মেনে নেওয়া হয়। লীলাবিলাসের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি চেতনায় জগৎ-পরিবেশে ব্রহ্ম ও শক্তির ভেদাবস্থা ও দ্বিত্ব স্বীকার করা

হয়। কবি তাঁর বহু কবিতার মধ্যে ঐ ভাবটি নানা জগৎ-পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত যে কোনো বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে কবির কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর সাধনধর্মের স্বরূপটির আভাস দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনার লক্ষ্যে ছিল রূপরসোত্তীর্ণ অমৃতব্রহ্ম। রূপব্রহ্ম ও রসব্রহ্মের সেবা ক'রে কবি তাঁর 'দেব দেউলের দ্বারে' সাধনলব্ধ 'প্রেম-পারিজাত মঞ্জরীর' অর্ঘ্য নিবেদন করছেন ও গেয়েছেন শান্তিমন্ত্র—

মন্থে না আর অন্তঃসাগর হিংসা দ্বেষের মন্দরে,
উথলে ওঠে শান্তি-সুধা গভীর নীরব কন্দরে। [শান্তি

কবি এনেছেন মৃত্যুর রথে অমৃতকে, দেখিয়েছেন ভীষণের মধ্যে সুন্দরকে, শুনিয়েছেন বজ্রে ও বংশীতে একই ধ্বনি, গেঁথেছেন বিরহের অন্তরালে মিলনের মালা, বহিয়েছেন বৈরাগীর অন্তরে প্রেমের ফল্গুধারা ও দিয়েছেন সন্ধান 'অক্ষয় সুখের, রূপাতীত রূপের ও রসের উৎসের লোকান্তরে'। কবি স্বধর্ম সাধনে সিদ্ধকাম হয়েছেন তাঁর কাব্যস্তবকুসুমসঞ্চয়নে। স্তবের মধ্যে দিয়ে মূল মন্ত্রের ব্যাখ্যা সাধারণত প্রকাশ করা হয়। মন্ত্র ও স্তব জনচৈতন্যের উদ্বোধক। বহু কবিতায় কবি মন্ত্র গেঁথেছেন ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন স্তবাকারে। মন্ত্র ও স্তবধর্মী কবিতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যে তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন, কবির কবিতাগুলির মধ্যে সেই তত্ত্বটি পরিস্ফুট। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন —

Our ignorance is Wisdom's chrysalis,
Our error weds new knowledge on its way,
Its darkness is a blackened knot of light ;
Thought dances hand in hand with Nescience
On the gray road that winds towards the Sun. [Savirtri 257-8

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন —

নরনারীর প্রাণ অরণি জ্বালায় তোমার যজ্ঞানল,···
বজ্রও যাঁর বংশীও তাঁর বুঝিয়াছি এই শেষবেলায়···
মৃত্যুর রথে অমৃত এসেছে, ধৌত করেছে অবিশ্বাস
ব্যর্থ নহে গো জীবন-বাসর রাগ বিরাগের নহে বিনাশ ··
সবার সেরা বন্ধু যিনি, ওরে কৃপণ, যাঁর দানে
পূর্ণ করিস মঞ্জুষা তোর চাইলি না তো তাঁর পানে। ··
কেন রহ প্রভু পূজা পায়নায়
মূর্তি ধরিয়া এস মর্ত্যের অযুক্ত অশ্রু সান্ত্বনায়···
অক্ষয় সুখ রূপাতীতরূপ রসের উৎস লোকান্তরে
রোদনেও নাথ তোমার করুণা বেদনার দানে ধন্ত মানি···

স্থান সঙ্কুলান প্রয়াসে কবির আরও অনেক মন্ত্র ও স্তবধর্মী কবিতা হতে উদ্ধৃত করা গেল না। শুধু সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি হতে বোঝা যাবে যে জনচৈতন্যের বোধনমন্ত্র ও স্তবাঞ্জলি কবি রেখে গেছেন তাঁর অজস্র কবিতার মধ্যে। ছন্দবদ্ধ শব্দযোজনা কবিতা হয়, কিন্তু 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' বা 'প্রেমপারিজাত মঞ্জরী' হয় না, যা তাঁর চরণে অর্ঘ্য দেওয়া যায়।

শুধু শব্দে ছন্দে ও কবিতার পরিবেশে রসরসায়ণ কবির কবিতাগুলিকে বৈশিষ্ট্য দেয় নি। তাঁর কবিতাগুলি তাঁর দিব্যানুরাগ প্রসূত তত্ত্ব ও তত্ত্বাতীত দিব্যানুভূতির সূক্ষ্ম আবেদন সম্পদে গরীয়ান। কবি বলেন যে 'শকুন্তভাষণে' অর্থাৎ কাব্যকাকলিতে 'কাঁদন-আতুর' সুর ক্ষ্যাপার কাকলি দিয়ে বুনে প্রকাশের ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। 'পাপিয়ার প্রতি' কবিতাটিতে কবি বলেছেন যে চিন্ময় দৃষ্টিতে দিব্য প্রেমানুভূতির যে প্রত্যক্ষ দর্শন, তাঁর প্রকাশের বাণী-নীরবে নিভৃতে সাধককে শুধু কাঁদন আতুর করে ও সেই প্রকাশের বাণী যা হয়ে যায়, তা ক্ষ্যাপার কাকলি— সকলে বুঝতে পারে না। ক্ষ্যাপা অর্থে ভগবদ-প্রেমিক মরমিয়া ভক্তকবি, যার কবিতা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নয়। মরমিয়া ভক্তকবির আত্মচৈতন্যলোকে যে চিন্ময় দিব্যদর্শনানুভূতি, তা দৈবীকৃপা-লব্ধ দিব্যদৃষ্টিতেই সম্ভব। দৈবীকৃপাকেই আত্মকৃপা বলা হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

I am the Mystery beyond reach of mind,
I am the goal of the travail of the suns ;
My fire and sweetness are the cause of life. [Savitri 335

বাক্যমনাতীত বলেই, দৈবীকৃপালব্ধ দিব্যদৃষ্টি সহায়ে সাধকের চিন্ময়-লোকে যে দিব্যদর্শনানুভূতি, কবি 'পাপিয়ার প্রতি' কবিতায় সেই কথা বলছেন—

> উলঙ্গ করিয়া হিয়া ক্ষ্যাপার কাকলি দিয়া বুনে যাস্ সুর,
> প্রকাশিতে অপ্রকাশে মুখরি শকুন্তভাষে কাঁদন-আতুর।

মরমিয়া ভক্তকবির দৈবীকৃপালব্ধ বা আত্মকৃপালব্ধ দিব্যদৃষ্টির ও দিব্যানুভূতির দর্শনের প্রত্যক্ষতা ভাষায় ব্যর্থপ্রকাশের প্রয়াস সত্ত্বেও স্বাত্মজ্যোতিতে ভাস্বর। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন —

A light not born of sun or moon or fire,
A light that dwelt within and saw within,
Shedding an intimate visibility
Made secrecy more revealing than the word :
Our sight and sense are a fallible gaze and touch
And only the spirit's vision is wholly true. [Savitri 525

কবি করুণানিধানের কবিধর্ম দিব্যদর্শনভিত্তিক। তিনি রূপ ও রসব্রহ্মের সেবা করে জ্ঞানলাভ করেছিলেন নির্গুণের, ধ্যান করতেন সগুণ-নির্গুণ বিবর্জিত পরমসত্যকে যা নিত্যদিনের দীপ্তিতে ভাস্বর। 'তন্দ্রাপথের অন্ত কোথায় নিত্যদিনের দীপ্তিতে?' এই প্রশ্ন কবি নিজেকে করেছেন ও তার উত্তর দিচ্ছেন—

ডুব দিনু আজ ধ্যান সাগরে সব বাসনার সুপ্তিতে,
জানব তাঁরে মৃত্যুভূমি পারে নি যাঁর রূপ দিতে। [তন্দ্রাপথে

মরমিয়া ভক্ত কবীর দাসের একটি দোঁহাতে পাই—

সগুণ কি সেবা করৌ নিরগুণা কর জ্ঞান
নির্গুণ-সগুণ কে পারে তাহৈঁ হমারা ধ্যান।

মরমিয়া ভক্তকবিদের ভাবগঙ্গায় পুণ্যস্নাত কবি করুণানিধান তাঁর 'কাব্য-শ্লোকস্রোতে' ভাসিয়ে দিয়েছেন 'প্রেমপারিজাত মঞ্জরী' তাঁরই চরণোদ্দেশে, মৃত্যুভূমি যাঁর রূপ দিতে পারে নি। শ্রীঅরবিন্দ সেই অমৃতসত্তাকে বলেন—

A boundless being in a measureless time. [Savirtri

পরাশক্তি দুই রূপে লীলা করেন—'যাদুকরী' ও 'বশীকরণী'। যাদুকরী শক্তি মায়াশক্তি বা অবিদ্যামায়া, বশীকরণী শক্তি বিদ্যাশক্তি বা বিদ্যামায়া। বিদ্যা-অবিদ্যার পারে পরাশক্তি মহামায়া। যাদুকরীশক্তি 'মন্দ-বিষে ভরা ফুলের তোড়া' মোহিনীশক্তি 'দুঃখভরা'। বশীকরণীশক্তি যাদুকরীশক্তিকে 'সর্বদুঃখহরা' মন্ত্রগীতিতে তখনই বশ করে যখন 'মরণ বধু' যাদুকরীশক্তির মরণ ঘটিয়ে সাধকের শিরে তৃপ্তিশীতল করের স্পর্শ দিল, পাইল যাদুকরীশক্তির বশীকরণ মন্ত্রগীতি—সাধকের সর্বদুঃখের হ'ল নাশ। বাসনার লয়ে দুঃখের লয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী বলেন—যা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। ৫৭

সংসারবন্ধ হেতুশ্চৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী। ৫৮ শ্রীশ্রীচণ্ডী ১ম অধ্যায়

'মোহিনী' কবিতাটিতে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রাপ্ত মন্ত্রটির অপূর্ব ব্যাখ্যা কবি করুণানিধান করলেন। 'সা'-সনাতনী পরাশক্তি মহামায়া, বিদ্যামায়া ও অবিদ্যা মায়া অর্থে বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি তাঁরই দুই শক্তি। তন্ত্রোক্ত মহামায়া তত্ত্বটি 'তন্দ্রাপথে' কবিতার কয়টি চরণে কবি মন্ত্ররূপ দান করলেন।

কবির 'মোহিনী' ও 'মনোহারিকা' কবিতা দুটি এই প্রসঙ্গে আর একটু আলোচনা করা যাক। 'মোহিনী' যাদুকরীশক্তি, 'মনোহারিকা' যাদুকরী শক্তিকে 'বশীকরণ' করেও—'সে কোন দেশে হাওয়ায় ভেসে কোথায় সে যে লুকিয়েছে'। 'মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত'—কথাটি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন। কবি 'মোহিনী' কবিতায় ঠাকুরের বাণীটিকে রূপ দিলেন। যাদুকরী মোহিনী-শক্তি মনে বন্ধনের ভাবকে সৃষ্টি করে, বশীকরণী 'মনোহারিকা' শক্তি মনকে বন্ধন মুক্ত করে। ঐ দুই শক্তির উৎস যে শক্তি—'কোন সে দেশে হাওয়ায় ভেসে

কোথায় সে যে লুকিয়েছে'। মনোহারিকা শক্তি প্রেম বা আনন্দ-'গানের মধু' ভাবে, কিন্তু রূপে—

একমনে সে শুনিতেছিল কানুর গানের অন্তরা
ব্রজবধুর দীর্ঘশ্বাসে চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।

অরূপে 'মনোহারিকা' কবির কাব্যলোকান্তরচারিণী 'মানসবনের অপ্সরী'। মনোহারিকাই আত্মাশক্তি—The one original transcendent Shakti, the Mother stands above all the worlds and bears in her eternal consciousness of the supreme Divine.—বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

শান্তি কোথায়? এই প্রশ্ন কবির 'শান্তি' কবিতায়। উত্তর কবিই দিচ্ছেন— যাঁর চরণ তলে প্রেম-পারিজাত মঞ্জরী।' তিনি কে? 'পূর্ণ তুমি অংশ তুমি আকার বিহীন সাকার হে। সাকারে নিরাকারে, সগুণে নির্গুণে অংশে ও পূর্ণে ব্রহ্মশক্তির লীলাই প্রেম বা আনন্দ। জীবন-মরণ সগুণ-নির্গুণ সত্তা মনের মধ্যে নিত্যই নূপুরধ্বনি করছে। জীবন সগুণের প্রতীক, মরণ নির্গুণের প্রতীক, সগুণ-নির্গুণের লয়লোকে যে অনির্বচনীয় নিত্যচৈতন্যলোক প্রেম বা আনন্দেই তার স্থিতি। কবি বলছেন—

মনের মাঝে নূপুর বাজে জীবন-মরণ গুঞ্জরী
ঝরে তোমার চরণ তলে প্রেম-পারিজাত মঞ্জরী।

ভক্ত করুণানিধানের কাব্যশ্লোকরাশি মূলতঃ ভক্তের অন্তরের বাণী। এই কথাটা স্মরণ রেখে তাঁর বাণীর মর্ম গ্রহণ করতে হবে। ভক্তের সাধনক্ষেত্র একটি আলাদা জগৎ। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করলে কবি করুণানিধানের সাধনক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কাব্যস্তবকুসুমাগুলি সম্ভারের মধ্যে। কয়েকটি কবিতা একটু আলোচনা করলে কবির সাধনক্ষেত্রের পরিধিনির্ণয় ও তাঁর ভক্তবাণীর মর্মোপলব্ধি করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। 'মৃণু' 'চণ্ডীদাস' 'শেষবাসরে' 'উদ্দেশে' 'জয়দেব'—কবিতা কয়টি ও 'রেবা' 'ওয়ালটেয়ার' 'শ্রীবৃন্দাবন' 'পঞ্চকোট' কবিতাগুলি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। প্রথম কয়টি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দ্বিতীয় কয়টি স্থানকেন্দ্রিক। ভাবকেন্দ্রিক কয়েকটি কবিতা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তি ও স্থানকেন্দ্রিক কবিতাগুলিতে কবি স্বধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছেন। রূপব্রহ্ম ও রসব্রহ্মের সেবা করে, রূপরসোত্তীর্ণ অমৃতব্রহ্মের যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, কবি তাঁর ব্যক্তি ও স্থান কেন্দ্রিক কবিতাগুলিতে তা প্রকাশের কার্পণ্য করেন নি। ভাবকেন্দ্রিক কবিতাগুলিতে যেমনি, ব্যক্তি ও স্থান কেন্দ্রিক কবিতাগুলিতেও তেমনি একটি দিব্যপ্রেমের পরিপ্রেক্ষণীতে কবিতার বিষয়বস্তুকে ভাবে ভাষায় ও ছন্দে অপূর্ব রূপ দিয়েছেন। কিশোরী মৃণুকে কবি লুকিয়ে দেখেও তাঁর পিয়াস মেটে না—'পিয়াস

না মিটে যতবার দেখি চেয়ে চেয়ে দেখে দেখে' কবির ঐ দৃষ্টি রূপকাঙালী কামজ দৃষ্টি। মৃণুর বিধবাবেশ কবির মনে আনল একটি আলোড়ন, মৃণু হয়ে গেল কবির মানসপ্রতিমা—'প্রাণপতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চায় জলন্ত প্রেমানলে।' এখন কবির দৃষ্টি রসকাঙালী কামহীন প্রেম দৃষ্টি। সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে, মৃণুকে নিয়ে সমাজ হতে বহুদূরে কবি ঘর বাঁধলেন। সুখের সংসারে মৃণু দিল কবিকে একটি শিশুকন্যা। হঠাৎ মৃণুর জীবনলীলা সাঙ্গ হ'ল। মৃণুর মৃতদেহের ওপর কবি ঢলে পড়ে যে রসাস্বাদন করলেন সে রস নূতনমদিরা—

ঢলিয়া পড়িনু বক্ষে মৃণুর—জীবন-মরণ মৃণু,
অধরসুধা সে শোষণ করিয়া নূতন মদিরা পিনু।

এবার কবি রূপরসোত্তীর্ণ অনির্বচনীয় প্রেমামৃতের আস্বাদ পেলেন। কবি বলছেন—'স্বপনের রূপ ধরিল আমার জাগরণ-অভিসার।' স্বপনের ঘোর কাটে যখন তখন—

কই কই কই? ওই যায় ওই হায় হায় করে হাওয়ায়
ঝলসিয়া যায় প্রাণের ভিতর হারালে কি পাওয়া যায়?

হারালে কি পাওয়া যায়?—এই প্রশ্নের উত্তর 'জাগরণ অভিসার' শব্দ দুটি হতে পাওয়া যায়, স্বপনের রূপ ও জাগ্রত রূপ প্রেমের দুটি রূপ। কবি ঐ দুটি রূপকে দেখেছেন 'মৃণু'তে 'শেষ বাসরে' ও 'উদ্দেশে' কবিতা কটিতে। 'শেষ বাসরে'—কবি ও কবিপ্রিয়া জীবিত, 'উদ্দেশে' কবি প্রিয়াহারা। ঐ দুই কবিতাতে কবি প্রেমের স্বপনের রূপ ও জাগ্রত রূপ, রূপে রসে ও রূপরসোত্তীর্ণ অমৃতত্বে করেছেন সুষমামণ্ডিত! 'শেষ বাসরে' কবি বলছেন—

পূর্বরাগের ফেনিল তুফান গেছে গো সরি।
যুগ্ম-হৃদয় স্বচ্ছ সলিলে উঠেছে ভরি—।
আগে যা বুঝি নি, আজি তা বুঝেছি;
কাছে যা ছিল, তা স্বপনে খুঁজেছি,
দু'জনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি পুলক ভরে—

স্বপনে খোঁজেন প্রেমের জাগ্রত রূপ অর্থাৎ অমৃতরূপ যার অনুভূতি হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ্রতপ্রেম দেহকেন্দ্রিক নয়, আত্মকেন্দ্রিক। 'উদ্দেশে' কবিতায় কবি বলছেন—

কাম কাঞ্চনে চঞ্চল মনে সাগরের তালে দিত গো দোলা।
দিশাহারা হয়ে এ পারের এই অলীক সুখের অহঙ্কারে,
চিনি নি সে পথ, যেপথ গিয়াছে মোর দেবতার দেউল-দ্বারে।

'স্বপনে' অর্থাৎ মোহমুগ্ধ দেহজ প্রেমে কবি দিশাহারা কারণ দেহজ প্রেম মোহময়ী অলীক। কবি চিনতে চেষ্টা করছেন জাগ্রত প্রেম যা সত্য ও অমৃত। মৃত্যু হ'ল প্রিয়ার, কবির বিশ্বাস হ'ল দেহজ প্রেমের অলীকত্ব ও

দেহাতীত বা জাগ্রতপ্রেমের অমৃতত্ব। কবি সগুণ ব্রহ্মের রূপ ও রস গ্রহণ করে তার অমৃতত্ব পেলেন মৃত্যুর রথে নির্গুণ ও সগুণের পরপারে। জীবন-বাসরে যেমন রূপরসে প্রেমবিরহ বা বিরাগ কবি অনুভব করতেন, জীবনাতীত-বাসরে কবি তাঁর প্রিয়ার প্রেম ও বিরহ, রূপ ও রসোত্তীর্ণ অন্তর্লোকে তেমনি অনুভব করছেন। নিত্যসত্য ও আনন্দময়লোকে প্রেমের বিশেষিত স্থিতি বলেই ঐ বিশেষভাবে অর্থাৎ বিরহেও সেখানে তার স্থিতি। কবি বিরাগ শব্দটি বিরহ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। মধ্যযুগীয় কোনো মরমিয়া কবি বিরহ শব্দে বিশেষভাবে-রহা বলে অর্থ করেছেন। মৃত্যুর পথে প্রেম যেখানে হ'ল অমৃতান্বিত সেখানে মিলনে বিরহে তার অখণ্ড নিত্যচৈতন্যসত্তায় শুধু আনন্দ, প্রকাশপ্রয়াসে যা 'অপ্রকাশ' হয়ে থাকে।

কবি প্রিয়াহারা কিন্তু 'কাঁদন-আতুর' হন নি বলেই বলতে পারছেন—

> মৃত্যুর রথে অমৃত এসেছে, ধৌত করেছে অবিশ্বাস,
> ব্যর্থ নহে গো জীবনবাসর রাগ-বিরাগের নাহি বিনাশ।

'হারালে যায় কি পাওয়া ?' 'মৃন্ময়' কবিতাটিতে কবির এই প্রশ্নের জবাব কবি নিজেই দিলেন 'উদ্দেশে' কবিতায়। প্রেমের স্বরূপ অমৃতত্ব, আনন্দ মিলন ও বিরহের মধ্যে তার স্বরূপটির নিত্যচৈতন্যলোকে অনুভূতি ভাষার অতীতে। 'মৃন্ময়' যেমন কবির জীবন-মরণ কবিপ্রিয়াও তেমনি।

'মৃন্ময়' ও 'উদ্দেশে' কবিতা দুটির অন্তর্লোকে যে রহস্য কবি রসাভাসে সাংকেতিকে ব্যক্ত করলেন, তার মর্মবাণী পাই শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে—

> Two fires that burn towards that parent Sun,
> Two rays that travel to the original Light. [Savitri 720

'মৃন্ময়' ও কবি, কবি ও কবিপ্রিয়া—Twofires, Two rays—প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের প্রেমশক্তি অখণ্ড প্রেমলোকে ঊর্ধ্বগামী।

> Two rays that travel to the original Light.

শ্রীঅরবিন্দের ঐ বাণীটির অনুরূপ রূপ-রসকার কবি করুণানিধান তাঁর 'চণ্ডীদাস' ও 'জয়দেব' কবিতা দুটিতে রূপ ও রসান্বিত করেছেন। চণ্ডীদাস রজকিনীকে বলেছেন—তুমি উপাসনা রসের সাধনা এস মনোবন্দিতা।

রজকিনী বলছেন ভাব-সমাধিলগ্ন চণ্ডীদাসকে—

> বসি একাসনে মিশিয়া দু'জনে নাম জপিয়াছি যাঁর,
> হেরগো ফুটেছে শিয়রের কাছে চরণ-পদ্ম তাঁর !

চরণ-পদ্ম—original light। Two rays—চণ্ডীদাস রজকিনী প্রেম। চণ্ডীদাস ধ্যানোত্থিত হয়ে বলছেন—

> সাঙ্গ আজিকে সংসার-খেলা, এসো বরাননি ধনি !
> হেরিব কৃষ্ণ, জীবন-কৃষ্ণ, রাধার হৃদয়মণি।

দুটি প্রেমানল জলছিল দুই হৃদয়ে। যখন প্রেমের দুটি শিখা একটি হ'ল, দুজনারই অন্তর্লোকের দৃষ্টিতে 'জীবন-কৃষ্ণ' দর্শন হ'ল প্রেমের অমরালোকে।

চণ্ডীদাস রসসাধক কিন্তু রূপরসোত্তীর্ণে তাঁর লক্ষ্য। রূপরসোত্তীর্ণ অমৃত-ব্রহ্মের আস্বাদন করে চণ্ডীদাস বলছেন—

মধুর অধরে, মধুর বদনে, মধুর নয়নে হাসি,
মধুর বেণুতে, মধুর রেণুতে পরসাদ মধুরাশি। [চণ্ডীদাস

'আনন্দম অমৃতমব্রহ্ম' যা চিরদিনই 'অপ্রকাশ'। জয়দেব শুষ্ক সন্ন্যাসী-যোগী-ব্রহ্মচারী। কিন্তু 'পদ্মাবতী' তাঁর জীবনের কিনারে এসে জয়দেবের 'জাগরণ-অভিসারের' পথ খুলে দিল। ব্রহ্মচারী নামসঙ্কীর্তনে মগ্ন। ধ্যান নেত্রে দেখছেন—

'মদন-মোহন'-রূপ মিলেছেন কিশোরীর রূপে,
ঢেকে গেছে রাকা শশী অনুরাগ-আবিরের স্তূপে

মুরলী নিস্বনে শুনছেন জয়দেব—

ধরগো অঞ্জলি তার, সে তোমার দ্বিতীয়-জীবন
বরনারী পদ্মাবতী ধরাতলে অমরা-স্বপন।

পদ্মাবতী পেলেন জয়দেবের মধ্যে 'মোহন-আনন্দ মাধব'। চণ্ডীদাস-জয়দেব-মৃণু-কবি কবিপ্রিয়া সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলিতে কবি শ্রীঅরবিন্দের বাণীটিকে রূপে রসে চরিত্রচিত্রণে অপূর্ব সুষমা দান করলেন। প্রেম অমর, প্রেমিক-প্রেমিকা অমর ও অমরী—কিন্তু প্রেমসত্তায় মুগ্ধা ভ্রমরী হৃদকমলমঞ্চে যখন 'দুজনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি পুলক ভরে'।

রেবার ধারে কবি এসেছেন। তাঁর অনুভূতি জাগল চিন্ময় সকাশের 'মহাকাশ' চিত্তাকাশ, চিন্ময় সকাশ। চিদগগন বা চিদাকাশ। রেবাকে কবি বলছেন—'প্রাণায়াম পরায়ন-সিদ্ধবাক ঋষিগণ ভাঙি মঠাকাশ

নিভৃতে তোমারি পাশে মিশেছেন মহাকাশে চিন্ময়সকাশ।' [রেবা

ওয়ালটেয়ারে 'সীমাচলের চরণ-মূলে' কবি দেখছেন—

অপরূপ এই পাষাণ-কূলে
কে তাপসী আননে তার ধ্যানের জ্যোতি ঢালা? [ওয়ালটেয়ার

কবি পরশমণির রশ্মিপথে ভেলা ভাসিয়ে দিলেন সীমাচলের চরণ-মূলে। ভেলাটি কবির সাধনভেলা। 'পথফুরানর দেশে' সীমাচলের চরণমূলে সেই ভেলা গিয়ে ঠেক্‌বে। পরশমণির রশ্মিপথটি হ'ল কবির দিব্যানুরাগ প্রসূত আত্মজ্যোতি যা তাঁর চিদাকাশ উদ্ভাসিত করেছে।

কবি একাধিকবার দারুকেশ্বরের স্বপ্নময়তীরে কেন গিয়েছিলেন কিসের আকর্ষণে? দারুকেশ্বর তীরে বশিষ্ঠারাধিতা ৺কল্যাণী মা তারার সিদ্ধ

পীঠ। তারাপীঠে লক্ষমুণ্ডাসন সিদ্ধাসন। বামদেব ঐ আসনে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন যাঁর পূর্বসূরী ছিলেন বশিষ্ঠদেব। 'পঞ্চকোটে' কবি বলছেন—

এসেছি পরম ক্ষণে এই বনে পদ্মাসনে বসিব পূজায়—
এ মঙ্গল নিকেতনে উপাসিব এক মনে ইষ্ট-দেবতায়!
নমি মা কল্যাণী তারা অমৃত-নির্মালাধারা পরসাদ দানে—
ঘুচাও-কুমতি মোর মুছাও আঁখির লোর শান্তি ঢাল' প্রাণে।
ভেঙে দে আমার ভুল, এ পঙ্কে ফোটা মা ফুল তোরই রাঙা পায়!
সমর্পিব মনে মনে জানিবে না কোনো জনে হেথা নিরালায়!

'উদ্দেশে' কবিতায় কবি বল্লেন—'একাক্ষর' সে মন্ত্র জপিয়া তাঁরই পদে চিত শান্তি চায়! তারা মায়ের কাছে শান্তিভিক্ষা করলেন। তারামা তারিনী দশ মহাবিদ্যার দ্বিতীয়াবিদ্যা। তাঁর সাধনা যেমন কঠিন তেমনি রহস্যপূর্ণ। কবির ইষ্ট মা তারা, 'একাক্ষর' বীজমন্ত্র তাঁর ইষ্টমন্ত্র। শাস্ত্র নির্দেশে সাধকের ইষ্ট বীজমন্ত্র জানলেও প্রকাশ করতে পারি না। শক্তিসাধনা না করলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'ন না তন্ত্রমতে। কবি হৃদপদ্মে শক্তিকে আসন দিয়েছিলেন। 'বন্দনা' কবিতা দ্রষ্টব্য। ষটচক্র নিরূপণে পাওয়া যায় যে শক্তি কুলকুণ্ডলিনী আধার পদ্মে জাগ্রতা হলে তাঁর ঊর্ধ্বগতিতে সাধককে করেন— 'বাচ্ কোমলকাব্য বন্ধার্চনা ভেদাতিভেদ-কর্মৈ'। ষটচক্র নিরূপণ ১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কবির প্রার্থনা শক্তির কাছে—

স্বচ্ছবিশদ, উজ্জল ভাষা দাও মা দাসে
গাঁথিব পুণ্য বাণীর মানিক ললিত ভাষে।

Sir Jhon Woodroffee বলছেন—

She (Sakti kulakundalini) produces melodious poetry and Bandha all other composition in prose and verse in sequence or otherwise in Sanskrit Prakrita and other languages.

[Serpent Power 391 Verse 10

কেন কবি বারে বারে দারুকেশ্বর তীরে মহাশ্মশান তারা পীঠে যেতেন, সেই রহস্য প্রকাশ করলেন 'পঞ্চকোটে' কবিতায়। শক্তি সাধনা—মনে, কোণেও বনে। কবি তারাপীঠের মহাশশ্মানের বনে সাধন করতেন। বলছেন কবি—'সমর্পিব মনে মনে, জানিবে না কোনো জনে হেথা নিরালায়।'

তারামায়ের চরণের তলে মহাশশ্মানের বনে কেন তারা বা দ্বিতীয়াবিদ্যার সাধন করতে হয় তার গূঢ়তত্ত্ব, যে তারা সাধনা করে নি তারাপীঠের মহাশ্মশানে, 'পঞ্চকোটে' কবিতাটির গূঢ়ার্থের আভাসই সে পাবে না। 'এ পঙ্কে ফোটা মা ফুল তোরই রাঙা পায়''—চরণটিতে ভক্তকবি কুমুদরঞ্জনের একটি কবিতার চরণ মনে পড়ে—'শিব হতে গেলে শব হতে হবে আগে।'

শিবহৃদয়ে শুধু শক্তির জগৎপ্রপঞ্চ লীলা। তাই শিব 'শব'—শিবহৃদি 'শ্মশান' বা চিদাকাশ। জাগতিক দৃষ্টিতে শিব শ্মশানবাসী, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শিবহৃদয় 'চিদাকাশ'। চিদাকাশে পরাশক্তি ও পরমশিব এক শক্তিসত্তা। 'পঙ্ক' হল ইন্দ্রিয় ও বিষয় জ্ঞান। সাধকহৃদয়ে 'ফুল ফুটবে', শক্তির পূর্ণলীলা হবে, যখন তার হৃদয় হবে শবাকার বা শিব। কবি শক্তিতত্ত্বের গূঢ়রহস্য ইঙ্গিত করেছেন—'এ পঙ্কে ফোটা মা ফুল তোরি রাঙা পায়।'

মায়ের রাঙা পা শিবহৃদয়োপরি অর্থাৎ শ্মশানহৃদিতে চিদাকাশে। ভক্তের হৃদয় শ্মশান সম না হলে, মা পা রাখবেন কেন ভক্তের হৃদয়ে। আর ফুল ফুটবে যখন ভক্তের হৃদয়োপরি, তখনই মায়ের রাঙা পা রাখবার মতো শব শিব-হৃদয় হবে। শবহৃদয় করবার জন্য কবি মাকে বলছেন—'ঘুচাও কুমতি মোর'। কামনাবাসনা পীড়িত হলে যতক্ষণ কামনাবাসনাকে জয় না করা যায় সাধনসৌকার্যে, ততক্ষণ সাধকের পঞ্চক্লেশ দগ্ধ জীবাত্মা দুঃখই পায়। 'আঁখিলোর' দুঃখের ব্যঞ্জনা মাত্র। কবি ভিক্ষা করেছেন মা তারার কাছে—কুমতির নাশ, কামনাবাসনা জয় ও তাঁর চরণে আত্মসমর্পণে শান্তি।

রূপরসোত্তীর্ণ 'সুদূর মনিকর্নিকায়' যেখানে 'কারণ-মধুনীরে আদি-অন্তের পরমবিকাশ ও মৃত্যুরও মরণ', 'শান্ত-সত্য নিরঞ্জনের' পূজারত কবি সাধনশক্তি ও কৃপাশক্তির সহায়ে সেখানে সেই অরুণিমার তীরে হলেন উত্তীর্ণ।

কত নামে কত রূপে কবি নামাঙ্কিত ও রূপায়িত করেছেন ব্রহ্ম ও শক্তির অখণ্ড সত্তাকে। শিব-শক্তি, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম যে কোনো নামেই পরম একেকে ডাকা হোক না কেন, রূপরসোত্তীর্ণ 'দিব্যদেউল দীপালিতে' তিনি আনন্দঘন প্রেমঘন, অরূপে অপরূপ। কবির মানসপুরীতে চিরদিবা বা বিভাবরী। সেখানে কে বিহার করত?

> অনাদি উষার পরম বাসরে যে মাধুরী রূপধরি
> বিরহে কবির মানসপুরীতে চিরদিবা বিভাবরী।

'যে মাধুরী রূপধরি'—দিব্যপ্রেম—কবির মানসপুরীতে নিত্যই বিহার করত। দিব্যপ্রেমই 'ভূমানন্দ' যা চিরসুন্দর জগৎপ্রাণ-সত্তায় নিত্যসত্য রূপে মরমিয়া ভক্তকবির চিদাকাশে উপলব্ধব্য। শ্রীঅরবিন্দ 'ভূমানন্দের' স্বরূপটি এইভাবে বলছেন—

> The Immense that calls to man to expand the Spirit,...
> A channel for the little he tastes of bliss. [Savitri 705

শ্রদ্ধাভক্তির আকুতি নিয়ে ভক্তকবির যে সব কবিতা পড়েছি ও যেগুলি এই প্রবন্ধে সামান্য আলোচনা করবার সাহস করেছি, তাতে আমার যা মনে হয়েছে তাই প্রকাশ করবার মতো ভাষাসম্পদ ও প্রকাশশৈলী আমার নেই। তাঁর দিব্যানুরাগ প্রসূত গহন অন্তর্লোকের উৎস হতে যে কাব্য

শ্লোকামৃত উৎসরিত তা পানে সুমধুর, অনুভূতিতে আনন্দ কিন্তু প্রকাশে 'কাঁদন-আতুর'। জড় ও চেতন বস্তুর সংগঠনে প্রতিটি অণুপরমাণু কবির জাগ্রতচৈতন্ত ও পরাশক্তির লীলাবৈচিত্র্যের আকর। সেই লীলাবৈচিত্র্য কবির দিব্যদৃষ্টিপথে রূপে রসে ও রূপরসোত্তীর্ণলোকে নিত্যসত্য। তাঁর দিব্যানুভূতি রূপে রসে ভাষায় ভাবে ও প্রকাশব্যঞ্জনায় সহৃদয় পাঠকচিত্তের আধার সাপেক্ষ সত্যের ও আনন্দের ঝঙ্কার তোলে।

জগৎ পরাশক্তির লীলাক্ষেত্র—শক্তিই হল 'জগৎপ্রাণ' যার আস্বাদন প্রেমে। 'জগৎপ্রাণ' অরূপ হলেও 'চিরসুন্দর'। ক্রান্তদর্শী ভক্ত করুণানিধান সকলের মধ্যে পরম একের বিচিত্র শক্তির লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করে সকলকেই একাত্মবোধে সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেছেন। সকল সত্তার মধ্যে অনুভব করেছেন শুদ্ধচৈতন্ত ও অমৃতানন্দের স্ফূরণ-সম্ভাব্যের। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিকোণ দিয়ে মরমিয়া ভক্তকবি করুণানিধানের কবিধর্মের মূল্যায়ন হয় ত সম্ভব হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন—For these things come not merely as an idea in the mind or a truth seeing but as an experience of the whole being and a total response is not only possible but above a certain level imperative. [Savitri letters 812

কবির কাব্যসম্ভারের একটি সামগ্রিক রূপ আমার মনে জাগে, কিন্তু ভাষায় সেইরূপটি ঠিক ব্যক্ত করতে পারব কি না এই ভেবে, আমি শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানালোক সহায়ে প্রকাশ করছি। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

In spite of death and evil circumstance
A will to live persists, a joy to be.
There is a joy in all that meets the sense,
A joy in all the experience of the soul,
A joy in evil and a joy in good.
A joy in virtue and a joy in sin. [Savitri 630

মরমিয়া কবি ভক্তসাধক, 'জগৎপ্রাণকে আনন্দযজ্ঞে আহ্বান করেছেন তাঁর কাব্যজগতে রূপে রসে ও রূপরসোত্তীর্ণ আনন্দ-অমৃতলোকে। তাঁর চরণে-প্রণাম।

দুই কবি এক বালক

সুধেন্দু মল্লিক

ছেলেবেলার বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে আমার ঠাকুরদা কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাছে। ইংরেজি ৪৮ সালে গ্রামের স্কুলে পড়তাম। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখতাম দাদু কি তন্ময় হয়ে কবিতা লিখছেন। প্রতি দিন ভোর রাত্রে চণ্ডীর মন্দির থেকে ফিরে এসে লিখতে বসতেন। আপন মনে—কখনো অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে লিখে যেতেন। আধোতন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর সদ্য লিখে চলা কবিতা শুনতে কি ভালোই না লাগতো! স্টোভে চায়ের জল বসিয়ে দাদু লিখতে বসতেন। কেটলিতে জলের শোঁ শোঁ শব্দ গাছের ডালে ঘরের চালে পাখি ডাকছে, ঘরে স্পিরিট জ্বলে যাওয়ার পরের আগুন আগুন গন্ধটুকু। ভোর বেলার এই আলস্য মধুর ছবি আজো মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। কখনো বিকেলে দেখতাম দাদু বাগানে মন্থর পায়চারি করছেন। আধময়লা ধুতি আর গেঞ্জি গায়ে। কোঁকড়া কোঁকড়া প্রায় রুখু চুল বাতাসে উড়ছে। দাদু কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে আপন মনে কবিতার টুকরো আবৃত্তি করছেন। আমরা তখন বারান্দায় মাস্টার মশায়ের কাছে লেখাপড়া করতাম। সেই উদাসীন-মনোহর ব্যাকুল বিকেলবেলায় অন্যমনস্ক দাদুকে দেখতে দেখতে আমার ইংরেজি পড়া, অঙ্ক কষা, সংস্কৃত মুখস্থ করা সব কিছু কোথায় যে হারিয়ে তলিয়ে যেতো তার ঠিক নেই।

আমাদের গ্রামে বিকেলবেলায় ডাকে আসতো। পিয়ন এলেই আমি লেখাপড়া ছেড়ে দাদুর কাছে দাঁড়াতাম। মাষ্টার মশায়ের কোনো ধমক তখন শুনতাম না। ডাক খুলে দাদুকে মাঝে মাঝে চিঠি পড়ে শোনাতে হতো। আর চিঠি বাছার অছিলায় চকিতে চোখ বোলাতাম—রামধনু শিশুসাথী বসুমতী প্রবাসী ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রপত্রিকার পাতায়। যাই হোক এমনি এক বিকেলবেলায় চিঠি এলো করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন কবি দাদুর কাছে আসছেন। দাদু অমনি আমার ঠাকমা পিসিমা সবাইকে বললেন—করুণা-দাদা আসছেন। কয়েকদিন থাকবেন। খুব আনন্দের কথা। ওঁর জন্যে সব ঠিক করে রেখো। দাদুর আর উৎসাহের শেষ নেই। তখন আমাদের বাড়ি মাটির ছিলো। একটা অংশ মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে দু-তিনটে থাকবার ঘর, রান্নাশাল, ঢেঁকিশাল, গোয়ালঘর এইসব। সেখানে থাকতেন আমার ঠাকমা, ছোট পিসিমা, ছোটকাকা। আর বাইরে একটা সুন্দর মসৃণ দেয়ালওয়ালা মাটির ঘরে থাকতেন দাদু। ক্যাম্পখাটে শুতেন। পাশে একটা চৌকিতে শুতাম আমি আর আমার দাদা। দুবেলা খাবার সময় ছাড়া দাদুর সঙ্গে ভেতর বাড়ির প্রায় কোনো যোগ ছিলো না।

যাই হোক করুণা দাদুর থাকার ব্যবস্থা হলো দাদুর ঘরে আমাদের চৌকিতে। দাদা বদলি হলো ভেতর বাড়িতে। আমি ওই ঘরেই থাকবো ঠিক হলো। পিসিমার কাছে শুনলাম করুণা দাদু এর আগেও একবার এসে থেকে গেছেন দাদুর কাছে। খুব লম্বা রোগা, একমুখ দাড়ি, সুন্দর চেহারা আর কথায় কথায় হাসেন চোখ বড় বড় করে।

দাদুর ঘরটি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হলো। আমার দাদু যে খুব নিখুঁত পরিপাটি ছিলেন তা নয়। তাঁর ঘরে জিনিসপত্র বই কাগজ সব হেলাগোছা হয়ে পড়ে থাকতো। কিন্তু তার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা লক্ষ্য করতাম। লেখার খাতা কলম পেন্সিল ঠিক জায়গায় থাকতো। হাতে দিলে বকুনি খেতাম। বিছানা পরিচ্ছন্ন থাকতো। কিন্তু অসহ্য রকমের পরিষ্কার ছিলো না। জামা-কাপড়ও সেই রকম। যে জিনিসটি সাবধানে রাখতে গিয়ে সর্বদাই হারিয়ে ফেলতেন—সে হচ্ছে টাকা পয়সা। আবার দাদুর সব কিছুতেই একটি সুন্দর উদাসীনতা ছিলো। খুব সামান্য জিনিসেও আগ্রহ দেখাতেন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত ছিলেন না। অযত্ন ছিলো কিন্তু উপেক্ষা ছিলো না। জীবনে তিনি একটি পিঁপড়েকেও অবহেলা করেন নি।

একদিন কার্তিক-অঘ্রাণের সকালে দাদুর সঙ্গে নদীর ঘাটে গেলাম। খেয়া পারাপার চলছে। শীতের হাওয়া আর রোদ্দুর মিশে সকালটিতে লেগেছে যেন গানের গতি। যতদূর তাকাই নীল আকাশ। বাবলার সূক্ষ্ম ডালপাতার ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে সাদা মেঘ। নদীর জল স্বচ্ছ। জলের নিচে সবুজ ঘাস আর শ্যাওলা দেখা যাচ্ছে। জেলেরা ভেলায় চড়ে মাছ ধরছে। আমি দাদুর কাছটিতে দাঁড়িয়ে আছি। নৌকো থেকে নামলেন এক দীর্ঘ মানুষ। হাওয়ায় উড়ছে ধূসর দাড়ি। অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দুটি চোখ। গায়ে হাল্কা নীল রঙের লম্বা কোট। পরিষ্কার ধুতি। গোটা মুখখানি খুশিতে ভরপুর। আনন্দের ভাবখানা দেখে মনে হলো (এক) দাড়ি আর (দুই) ধুতি কোট ছাড়া আমার সঙ্গে ওঁর বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। ইচ্ছে হলে এখনি দুজনে পাল্লা দৌড় দিতে পারি মেঠো রাস্তায়। তিনি তো নেমেই দাদুর হাত ধরে হাসতে হাসতে বললেন।—চলে এলাম কুমুদ তোমার কাছে। দাদু ততক্ষণে ভূমিষ্ঠ প্রণাম সেরে জড়িয়ে ধরে বলছেন—আমার বড় আনন্দ হচ্ছে করুণা দাদা। করুণা দাদু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। দুজনের হাসি দেখে আমারও খুব আনন্দ হলো। হয়তো মনে হলো।আবার দীর্ঘ ছুটির দিন এসে গেলো পৃথিবীতে। আর কোনো সমস্যা নেই। এখন খাও দাও আনন্দ করো।

আমার দাদুর মধ্যে একটি ছেলেমানুষি সারল্য ও ভালোবাসা ছিলো। তাঁর দৈনন্দিন কাজ—বিশ্রাম কবিতালেখা (দাদু বলতেন পদ্যলেখা) বাগান-করা আমাদের সঙ্গে গল্প-করা—কোনো কিছুতেই মনে হতো না তিনি আমাদের

থেকে পৃথক কেউ। যেন আমাদেরই কাজ সবাই মিলে করছি। হাসতে হাসতে আনন্দ করতে করতে। বলতে কি দাদুর মতো অমন চিরবন্ধু চিরসঙ্গী আমার এ জীবনে একজনও ছিলেন না। আর তাঁর অভাব কখনো পূরণ হবে না, কোথাও কিছু ঘটলে দাদুকে না জানানো পর্যন্ত শান্তি পেতাম না। মজার কোনো গল্প পড়লে বা শুনলে সেটি দাদুকে শোনানো চাই-ই। দাদু এতো উচ্ছল ঝর্ণার মতো হাসতে পারতেন। ওই হাসিটি শোনার লোভ আজো যায় নি। করুণা দাদুও এদিক থেকে দাদুর দোসর ছিলেন। দুজনেরই অদ্ভুত ছেলেমানুষি ভাব। ছেলেমানুষি খাওয়া-দাওয়া সপ্রতিভ সরল ব্যবহার দুজনের মুখে সকলের প্রশংসা আর কোন কথা শুনলে অবাক হয়ে যাওয়ার ভাব, করুণা দাদুও একমুহূর্তে আমার হৃদয় জয় করে নিয়ে ছিলেন।

করুণা দাদুও উঠতেন খুব ভোরে। খালি বলতেন সীতারাম—সীতারাম কহো। দাদু হাসতেন। বলতেন—দাদা, তোমার তো ভক্তি নেই। তুমি কেন টিয়াপাখির মতো সীতারাম কহো বলো। তুমি সৌন্দর্যের কবি—প্রকৃতির কবি। তুমি তোমার সেই সব কবিতা আবৃত্তি করো। করুণা দাদু এতটুকু অপ্রতিভ বা বিরক্ত হতেন না এ সব কথায়। উনিও হাসতেন। বলতেন—যা বলেছো ভাই। তোমার ভক্তি কোথায় পাবো? তবে কি জানো অভ্যেস হয়ে গেছে। করুণা দাদুকে নিজের হাতে চা করে খাওয়াতেন দাদু। বলতেন—একটা কটেজ ক্রীম বিস্কুট খাও করুণা দাদা। খুব ভালো খেতে। তার পর শুরু হতো কাব্যচর্চা। ততক্ষণে রোদ এসে পড়েছে বারান্দায়। করুণা দাদু এসে বসতেন বেঞ্চিতে। আর দাদু তাঁর প্রিয় ইজিচেয়ারে। অধিকাংশ সময়েই স্মৃতি হতে কবিতা আবৃত্তি করতেন করুণা দাদু। কি গভীর ভরাট গলা ছিলো তাঁর। কখনো দেখি নি এতোটুকু জড়তা বা দীনতা। ওঁর কাছে শুনেছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবৃত্তি শুনতে ভালোবাসতেন। সেই প্রথম তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতাটি শুনি। কখনো দাদুর কবিতা একটার পর একটা একটুও না থেমে আবৃত্তি করে যেতেন। আমাদের বলতেন—তোমাদের দাদু একজন মহাকবি। এমন কবিহৃদয় আর হবে না। সকালে সেই কবিতার আসরে গাঁয়ের নানান ধরণের মানুষ এসে বসতেন। কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষক, কেউ অলস দিনমজুর, কেউ-বা নিতান্তই বাউণ্ডুলে। দাদুর বারান্দায় বসতে কারো বাধা বা অনাদর ছিল না। একবার গাঁয়ের একজন মুটে মজুর দাদুকে আস্তে আস্তে সংগোপনে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বাবু মশায়, তা উনি কতো বড়ো কবি হবেন? আপনার চেয়ে বড়ো? উঃ কি ফোয়ারার পারা পদ্য বলতে লাগলেন। দাদু হাসতে হাসতে বলে ছিলেন—হ্যাঁ উনি আমার চেয়ে অনেক বড়।

আবার কবিতার আসর বসতো সন্ধ্যেবেলায়। এই আসরটি কিন্তু খুব

ছোট আর ঘরোয়া। বাইরের লোক কেউ থাকতো না। দাদুর ঘরের বারান্দায় বসা হতো। আমার লেখাপড়া শেষ করে নিশ্চিন্তে যোগ দিতাম, আসতেন আমার ঠাকমা. করুণা দাদুর গলায় গমগম করে বাজতো—

আজো ফোটে তেমনি শোভায় বন গোলাপের লাল কুঁড়ি।
নিথর হয়ে প্রজাপতি বসে গো তার বুক জুড়ি।
বাঁধের ঘাটে পূর্ণিমা সে চুপি চুপি নাইতে আসে—
গুমরে উঠি শুনি যখন বাজে তরল জল চুড়ি।

ঝুমকার ওপর লেখা কবিতা। দাদু আহা আহা করে উঠতেন। ঠাকমার একটি প্রিয় কবিতা ছিলো। ধীরে ধীরে বলতেন—আপনি সেইটি একবার বলুন। স্ত্রীর মৃত্যুতে করুণা দাদুর লেখা সেই কবিতাটি ঠাকমার অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। এই কবিতাটি শোনাতে গিয়ে, আমি সেই বালক বয়সেও লক্ষ্য করতাম করুণা দাদুর গলায় কেমন বিষাদময় অথচ সুললিত সুর। করুণা দাদু আরম্ভ করতেন—'মরণের ছায়াচিকোর ওপারে লুটাইছে তব নীলাম্বরী/ হাত বাড়াইয়ে পাইনে নাগাল পরশের আগে যাও গো সরি।' সুদীর্ঘ কবিতা কত সুখস্মৃতি বিজড়িত। দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের মতো করুণ মর্মস্পর্শী ও আত্মমগ্ন। 'বজ্রও যাঁর বংশীও তাঁর বুঝিয়াছি এই শেষ বেলায় / 'একাক্ষর' সে মন্ত্র জপিয়া তাঁরই পদে চিত শান্তি পায়।' কবিতাটির শেষ দুটি লাইন আবৃত্তি করে করুণা দাদু নীরব হয়ে বসে থাকতেন। আকাশে তারা ঝক ঝক করতো। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। আউচফুলের গন্ধে বেদনাহত বাতাস প্রতিটি গাছের পাতা সরিয়ে কি যেন খুঁজতো। অন্যমনস্ক জোনাকি ফিরতো লেবুর ঝোপে। তালগাছের পাতায় শব্দ হতো। বাঁশপাতা ঝরে পড়তো মৃদু নিঃশ্বাসের মতো। অনুভব করতাম কি রোদন ভরা শান্তি। মৃত্যুর বা স্ত্রীর মৃত্যুর বিষাদ কিংবা প্রেম বোঝার মতো বয়স বা ক্ষমতা এখন আমার হয় নি। কিন্তু সেই কবিতার বিষন্ন কমনীয় শান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। আরেকটি ছোট্ট কবিতার অংশ মনে আছে। 'দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে রাসদেউলে দাঁড়িয়ে সে / কন্ধা পেড়ে শাড়ীর দোলা তর্জনীতে জড়িয়েছে / এক মনে সে শুনতে ছিলো কানুর গানের অন্তরা / ব্রজবধূর দীর্ঘশ্বাসে চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।' সব কিছু যেন জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতো করুণা দাদুর কণ্ঠস্বরে। 'স্বপ্নময় তার কাহিনী আজকে সখি দ্বিপ্রহরে/নোনা পাতার সোনার গায়ে রবির কিরণ পিছলে পড়ে।' নিতান্ত বালক মনও ব্যাকুল হয়ে উঠতো এই কথায়।

করুণা দাদুর ঈশ্বরকে নিয়ে লেখা কবিতা আমার দাদু খুব পছন্দ করতেন না। করুণা দাদু সেই সময় গীতার (আংশিক কি পূর্ণ মনে নেই এখন) একটি পদ্যে অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দাদুকে শুনিয়ে ছিলেন। মাঝে কবিত্বে মুগ্ধ হলেও দাদু কিন্তু খুব খুশি হন নি। পরিষ্কার বলতেন—দাদা, ভগবান ভালোবাসা ও

উপলব্ধির জিনিস—বর্ণনায় নন। হয়তো দাদু ভাবতেন করুণা দাদুর উপলব্ধি হয় নি। হয়তো তাঁর মতে দাদু ঠিক ছিলেন। আমার কথাগুলোই মনে আছে। কিন্তু এ নিয়ে চিন্তা করার মতো মানসিক সামর্থ্য তখন আমার ছিলো না। অবশ্য এখনো আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আজো আমার কানে বাজে করুণাদাদুর সেই বিভোর হয়ে বলা লাইন কটি—'রথের কাছি ধরিয়া আছি পথের ধারে ঘর / দিবেন যা হয় শ্রীভগবান / ধরিব সেই প্রসাদী দান। ভিক্ষাধনে কুণ্ঠা নাহি জয় প্রেম সুন্দর।' আজ মনে হয় এ কথা কেউ কি (অন্তত করুণানিধান) বানিয়ে বলতে পারেন। এখন আমি এই ভাবি যে ঈশ্বর করুণানিধানের অবলম্বন ছিলেন। ব্যথাপীড়িত মানুষ যে ভগবানের কাছে আশ্রয় চায়, শান্তি চায়, হাত ধরে এগিয়ে যেতে চায়, করুণাদাদু নিশ্চয়ই সেই দুঃখীর ভগবানের দেখা পেয়েছিলেন ও তাঁর ওপর নির্ভর করেছিলেন। তাঁর ইষ্টোপলব্ধি নিশ্চয়ই হয়েছিলো। না হলে যে কৃষ্ণ বাক্য বৃথা হয়ে যায়—যে কথা 'মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম'। দাদুর কাছে ঈশ্বর কোনো অবলম্বন ছিলেন না। জগতের সুখ দুঃখের অতীত যে প্রেমময় হরি সেই হরিই তাঁর জীবন। তুমি প্রভু আমি দাস। তোমার প্রীতি ছাড়া আর কোনো প্রার্থনা আমার নেই। এইটিই দাদুর আধ্যাত্মিক গঠন ছিলো আমার বিশ্বাস। ফলে করুণাদাদুর ঈশ্বর ভাবনা দাদুকে হয়তো আকৃষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক।

দাদুর কাছে কবিতযশঃপ্রার্থীর ভিড় কিছু কম হতো না। নানান অদ্ভুত ধরণের লোকের দেখা আমরা সেই সময়ে পেতাম।

করুণা দাদু যখন এলেন, তখন তাঁর কাছেও যাতায়াত আরম্ভ হয়ে গেল। ঐ ধরণের লেখক এলেই দাদু বলতেন—করুণাদাদা বড় কবি তুমি তাঁকে শুনিয়ে খুশি করো। কবিতা শুনিয়ে—সে ভালো মন্দ যাই হোক—করুণা দাদুকে কেউ কোনোদিন ক্লান্ত করতে পারে নি। আমাদের পাশের গাঁ আটঘরায় একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায় ছিলেন—নাম শ্রীপতি ভট্টাচার্য। দাদুর চেয়ে বয়সে বড়। তাঁরও পদ্যলেখার খুব বাতিক। একদিন তিনি এসে হাজির করুণা-দাদুকে পদ্য শোনাতে। দাদুর ঘরের পাশেই ছিলো গাঁয়ের পাঠশালা। সেখানে দাওয়ায় দুখানি চেয়ার নিয়ে দুজনে বসলেন। দাদু গেলেন না। আমি কাছাকাছি মজার আশায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একের পর এক স্বরচিত পদ্য মুখস্থ শোনাতে লাগলেন ভটচার্জ মশায়। করুণাদাদুর মুখের কাছে তাঁরও লম্বা দাড়ি ভরা মুখ নিয়ে এসে গলা কাঁপিয়ে হাত মুখ নেড়ে সে এক কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন যেন। ভটচাজ মশায় বিভোর হয়ে শোনাচ্ছেন, আর করুণা দাদু দুচোখ বড় বড় করে উৎকর্ণ হয়ে সেই কাব্যগুঞ্জন শ্রবণ করছেন। মাঝে মাঝে ভটচাজ মশায় কোনো কোনো পদ্যের ভেতরের কথা সরল বাংলা

ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পদ্য শোনানোর পর করুণা দাদু আনন্দে আটখানা হয়ে দাওয়া থেকে নামতে নামতে দাদুকে ডাকতে লাগলেন—কুমুদ ও কুমুদ, শ্রীপতি বাবু তো খুব উঁচুদরের কবি। ভটচাজ মশায়ের খুশি আর ধরে না তাই শুনে।

করুণা দাদু ছোট ছেলেমেয়েদের বড় ভালোবাসতেন। আমাদের গাঁয়ে এবং বাড়িতে এদের অভাব ছিলো না। সবাই ওঁর প্রিয় ছিলো। সে সব দিনে ফেরিওয়ালা বিক্রি করতে আসতো মোটা চিনি মাখানো দানাদার, মণ্ডা, গরম আলুর চপ, বেগুনি, ঝালবড়া আবার কত কি। করুণা দাদু মহা আনন্দে সেই সব প্রচুর কিনতেন। আর আমাদের ডাক দিয়ে বলতেন—ভাই এসো সব। বালক ভোজন হবে এবার। প্রত্যেকের হাত ভরে দিতেন সেই সব আজো-জিবে-জল-আনা খাবার। দাদুকে বলতেন—জানো কুমুদ ছোট ছেলেদের খাওয়ালে রাম বড়ো খুশি হন। সীতারাম, সীতারাম কহো। বলে দাদুকে ভাগ দিতেন। আমরা সবাই মিলে আনন্দ করে খেতাম।

আমার দাদু ও করুণা দাদু দুজনেই অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন। মানুষের গুণের দিকটাই তাঁরা বড় করে দেখতেন। অনেক সাহিত্যিক ও তাঁদের বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে তাঁরা কথা বলতেন। কিন্তু কখনো তাঁদের মুখে বিদ্বেষ বা ঘৃণাব্যঞ্জক মন্তব্য শুনি নি। রবীন্দ্রনাথ বলতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় তাঁরা আপ্লুত হতেন। রবীন্দ্রনাথ নামটি তাঁদের কাছে যেন ইষ্টমন্ত্রের মতো পবিত্র ছিলো। দাদু বলতেন—রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁকে কবি কুমুদরঞ্জন বলে আলিঙ্গন করে-ছিলেন। তাই তার পর থেকে তাঁর আর কোনো দুঃখ নেই, কোনো আকাঙ্ক্ষাও আর নেই।

করুণাদাদু কিন্তু লোকচরিত্র দাদুর চেয়ে ভালো বুঝতেন বলে আমার মনে হয়। ওঁর মাসে মাসে পেন্সন আসতো মানি অর্ডারে। যতদূর মনে পড়ে আশী টাকা করে। একদিন বিকেল বেলায় পিয়ন এসে বললো—আপনার ৮০ টাকার এম. ও. আছে। আমি গুনে এনেছি। বলে একগাদা রুপোর টাকা করুণাদাদুর সামনে রেখে দিলো। বললো সব ঠিক আছে, আপনি শুধু এখানে সই করে দিন। করুণাদাদু বললেন—না বাবা তা হবে না। আমি বুড়ো মানুষ। একা অতো গুনতে পারবে না। তুমি আমার সামনে গুনে দিয়ে যাও। বিষণ্ণ মুখে পিয়ন গুনতে বসলো। শেষে দেখা গেলো ৪।৫ টাকা কম। পিয়ন থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে বাকি টাকা বার করে দিলো। করুণাদাদু তাকে মিষ্টি খেতে দুটি টাকা দিলেন। পিয়ন চলে যেতে করুণাদাদু চোখ বড় বড় করে বললেন—দেখলে কুমুদ আর একটু হলেই ঠকে যাচ্ছিলাম আর কি! তখনি সন্দেহ হয়েছিলো, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে বললাম—গুনে দিয়ে যাও। করুণাদাদু হুঁশিয়ার ছিলেন কিন্তু হিসেবী ছিলেন না। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে

ভালোবাসতেন, কিন্তু পাহারা দিয়ে রাখতেন না, সব কিছু নিখুঁত ভাবে করতেন। রুপোর পকেট ঘড়িটি বিছানার কাছে দেয়ালে টাঙানো থাকতো। ট্রাঙ্ক থাকতো চৌকির নিচে। বেশবাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জীবনযাত্রা ছিলো তাঁর কবিতার মতোই ছন্দময়। দাড়ির পারিপাট্য দেখবার মতো ছিলো। দাদু ও করুণাদাদু দুজনেই আতর মাখতে ভালোবাসতেন। আর দুজনেই ছিলেন ভোজন রসিক। কিন্তু খেতেন কম।

আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে করুণা দাদুকে আমি কবিতা লিখতে দেখি নি। কিন্তু তাঁর মনটি সব সময়েই কাব্যভাবনায় পরিপূর্ণ থাকতো। মাঝে মাঝে বলতেন —শব্দ কি সোজা জিনিস, ওরে বাবা। শব্দ ব্রহ্ম। বুঝলে কুমুদ। শব্দ নিয়ে ছেলে খেলা নয়। একবার আমি কি কথায় যেন 'বিরাট' শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম। করুণাদাদু চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে বললেন—দেখছো কুমুদ, ছোটছেলে কেমন অক্লেশে বললো 'বিরাট'। বিরাট কি চাট্টিখানি কথা! এতোই সহজ। বিরাট দেখে অর্জুনের মাথা ঘুরে গিয়েছিলো। বলে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। আজ বুঝি করুণাদাদুর মতো অতবড় কবিসত্তা খুব কম লেখকেরই হয়। কবিতা অনেকেই লেখেন। লিখে নাম যশও করেন। অর্থ প্রতিপত্তিও হয়। কিন্তু কাব্যময় আত্মা—সে স্বতন্ত্র ব্যাপার—একান্ত দুর্লভ। করুণানিধান সেই দুর্লভ আত্মার পুরুষ ছিলেন।

মাস কয়েক কাটিয়ে করুণাদাদু আবার কোথায় চলে গেলেন। পরের বছর ইংরেজি ৪৯ সালে আবার তাঁকে দেখলাম কাঁথিতে বাবার কাছে। বাবা তখন ওখানে বদলি হয়ে গেছেন। কাঁথির কাছে সমুদ্র বলে করুণাদাদু বেড়াতে এসেছেন। এখানেও বাবার বসার ঘরে সাহিত্য সভা বসতো। নানান বিষয়ে আলোচনা চলতো। করুণাদাদুও সেই আসরে যোগ দিতেন। একদিন করুণাদাদুকে বললাম—আর তো বালক ভোজন করাচ্ছেন না দাদু। একবার হয়ে যাক। করুণাদাদু কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন—খেপেছো? দেখছো কি রকম কড়া ব্যবস্থা, এখানে কেউ বাজারের তেলেভাজা আনে! আর তা ছাড়া বৌমা (আমার মা) তো চব্যচোষ্যের কিছু বাকি রাখছেন না চার-বেলা! যাই হোক কোগ্রামের সেই পরিবেশ ও স্বাধীনতা না পেলেও, করুণা দাদুর স্নেহময় সান্নিধ্য এখানেও পেতাম, প্রত্যেক দিনই কিছুটা সময় আমাদের সঙ্গে খোসগল্প হাসিঠাট্টা করতেন। আমার বোনেদের ডাকতেন—কই গো সখিরা, গেলে কোথায়! করুণাদাদু যখন চলে আসেন তখন আমরা ভাই-বোনেরা মিলে ওঁর ট্রাঙ্কে লাগানোর জন্যে একটি তালা উপহার দিয়েছিলাম। এই উপহারে তিনি এতো খুশি হয়েছিলেন যে একটা কবিতাই লিখে ফেললেন আমাদের নিয়ে এবং তালাটির উল্লেখ করে। বহুদিন পর এই প্রথম আবার কবিতা লিখলেন করুণাদাদু। লেখা হতেই আমাদের পড়ে শোনালেন।

একটা লাইন ছিলো—জয়ার দরোজা খুলে দিলি তোরা ভাঙিয়া কুলুপ তালা। তার পর নিজের মনেই বললেন—কুলুপ তালা তো একই মানে। কি করা যায় আর। বিস্তর শব্দ বিবেচনা করা হলো। কোনোটাই করুণাদাদুর মনঃপুত হয় না। আর যদিবা মনে ধরে, ছন্দে ধরে না—তালা ভাঙতে হয়। তালও ভাঙে। খুব জটিল পরিস্থিতি। আমি তখন গোপনে—খুব গোপনে দু-একটি পদ্য লিখতে শুরু করেছি। আমি বললাম কুলুপের বদলে জীর্ণ কথাটা দিলে কেমন হয়? করুণাদাদু একগাল হেসে বললেন—হ্যাঁ চমৎকার হয়। 'কুলুপ' কেটে লিখলেন জীর্ণ। তার পর লেখাটি পাঠিয়ে দিলেন 'পূর্বাচল' বলে একটি পত্রিকায়। সেটি কবি যতীন্দ্র বাগচী বার করতেন। কিছুক্ষণ পরে করুণা-দাদু হঠাৎ চিন্তিত হয়ে বললেন—জয়ার দরোজা খুলে দিলি তোরা ভাঙিয়া জীর্ণ তালা—এ কেন লিখলাম? উল্টো মানে হতে পারে তো! জীর্ণ তালা ভেঙে জয়ার দরজা খুলে দিলি সে কি আরো ভালো করে জরা ঢোকার জন্যে, বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন। আর কোনো উপায় নেই। লেখা ডাকে দেয়া হয়ে গেছে একটি অর্বাচীন বালকের সংশোধন সহ।

করুণাদাদুকে শেষ দেখলাম কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে ১৯৫৪ সালে। কবি সম্মেলন। দাদুকে নিয়ে গেছি। সেখানেই প্রথম দেখলাম সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে। জীবনানন্দ তার কয়েকদিন পরেই ট্রাম দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। করুণাদাদু এলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য। নিস্প্রভ। সামনে ঝুঁকে পড়েছেন। অত্যন্ত অস্থির ভাব। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। দাদুকে বললেন—কুমুদ বন্ধ ঘরে আর বসতে পারি না। জামার বুকের বোতাম সব খোলা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছেও কবিতার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। একটি নতুন লেখা কবিতা পড়লেন। সেই স্পষ্ট সতেজ স্বর। মাঝে মাঝে একটু কেঁপে যাচ্ছে। জরাকান্ত জীর্ণ রাজ-হংসের শেষ গান।

করুণানিধান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হাওয়ায় তখন সুর ছিল, আর
ছন্দে বাঁধা ঝংকারিত নূপুর।
সে-যুগ তোমার অতুল কবিকণ্ঠে
হয়েছিল আরো সরস মধুর।

এখন সে-যুগ বাতিল করা খরায়
রসের সঙ্গে বাড়ছে ব্যবধান।
মাঝে মাঝে তাই তো পিপাসিত
তোমায় স্মরি করুণানিধান।

কবি করুণানিধান স্মরণে

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কত বর্ষ হ'ল গত আজও হেরি জাগ্রত স্বপনে
বীণায় ঝঙ্কার সম তোমার আবৃত্তি পড়ে মনে।
রূপে রসে সুরে স্বপ্নে তুমি ছিলে পরিপূর্ণ কবি
ভারতীর করতলে তুমি ছিলে সপ্ততন্ত্রী ছবি।

শান্তিপুর ডুবু ডুবু যে প্রেমে নদীয়া ভেসে যায়
উদ্বেল প্লাবনে তার ডালি তুমি দিলে আপনায়।
জীবনরসের কবি, মুক্তি ক্ষেত্র প্রতি তীর্থভূমি
সমুদ্র-মেখলা-পৃথ্বী হিমাদ্রিরে প্রণমিলে তুমি।

যাযাবর তীর্থঙ্কর, বাণীপদে নিবেদিত প্রাণ—
বিত্তহীন অনাসক্ত ভক্তি-দীপ চিত্তে অনির্বাণ।
সুন্দরের বন্দনায় গাঁথিয়াছো কাব্যে 'শতনরী'
'শান্তিজল' 'ঝরাফুলে' কি সুরভি রাখিয়াছো ভরি!

করুণানিধান তুমি, করুণার পূর্ণ পরিচয়
তোমার 'প্রসাদী' ফুল 'সাহিত্যতীর্থে'র শীর্ষে রয়।

করুণানিধান স্মরণে

হরপ্রসাদ মিত্র

লোকে বলে তুমি ছিলে সৌন্দর্যের কবি,
সত্যেন্দ্রের রূপরাগ, ছন্দের ও ব্যঞ্জনা
বঙ্গসুন্দরীর কবি বিহারীলালেরও
তুমি নাকি উপসর্গ—কী জানি, কী জানি !
লিখেছিলে 'পদ্মাতটে' সেটা কোন্ সালে ?
পঞ্চকোটে ছিলে তুমি কোন্ ঠিকানায় ?
স্বপ্নরসে ছিলে নাকি নিয়ত বিভোর ?
যারা বলে, তারা ক্রমে গণ্যমান্য হয়।
ব্যঙ্গে কিংবা রঙ্গরসে ছিলে কত ফিকে ?
অন্যান্যের তুলনায় থাকবে কি টিঁকে ?
এ সব ঘোষণা আর বিতর্ক সত্ত্বেও
স্নিগ্ধতা অমরা জানি 'ধানদূর্বা'ও।
এ জীবনে দু'নয়নে ঝরেছে আসরে,
তুমি জানো সব ফুলই ঝ'রে যায় আর—
সর্বত্র নিরখে মন মায়ের প্রতিমা,
যা থাকে তা কবিতার অশেষ যন্ত্রণা।

করুণানিধান

গোপাল ভৌমিক

কবিতা হয়তো অনেকেই লেখে
থামতে সময় মতো জানে কম
যেহেতু জালে জড়িয়ে পড়ে সব
খ্যাতি হয়ে দাঁড়ায় বিড়ম্বনা।
তুমি ব্যাতিক্রম এই পোড়া দেশে
যদিও তোমার লেখনীতে ধার
কারও চেয়ে কম ছিল না মোটে
এবং শ্যামলিমা ছিল চোখ ভরা।
অথচ থেমেছ তুমি সময়েই
খ্যাতির চূড়ায় উঠে না লেখার
ব্রত নিয়ে তুমি দেখালে যে পথ
আমরা তা এড়িয়েই চলি ফিরি
করুণানিধান তাই কবিতায়
স্থির সংযমের নিগূঢ় প্রতীক।

নাম নিয়ে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

নামে কিবা আসে যায় ?
এই প্রশ্ন হয়তো বা অর্বাচীন নয়,
তবু নাম অনেক সময়
নামীকে সু-উচ্চে রাখে.
সে দৃষ্টান্ত নয়কো বিরল ;
সে নামের শুভ ডাকে
অনেকেরই আসে ভাবনায়
কাব্যকুসুমাঞ্জলি 'বঙ্গমঙ্গল'।
সকলের উন্নয়ন
ছিল যার পুণ্য কামনায়,
সদানম্র সেই মহাত্মাকে
জন্মশতবর্ষে যেই করিতে স্মরণ
হঠাৎ উন্মুখ হয়ে ওঠে লক্ষ মন,
ভেঙে দিতে সব ভুল
পেতে তাঁর 'প্রসাদী' ও প্রিয় 'ঝরা ফুল'
এ অশান্ত আবহাওয়ায়
কাম্য 'শান্তিজল'।
শতবর্ষে সন্তানেরা আরো পেতে চায়
সুপ্রশস্ত হাতে তাঁর
আশীর্বাদ সে 'ধান দুর্বা'য় ;
তাঁর 'শতনরী' নিয়ে যায় 'স্বপ্নলোকে',
'দ্বিপ্রহরে' অকস্মাৎ 'শেফালী' সুবাসে
অন্তরের অন্তর্লোকে 'বাসনা' জাগায় !

নামে কিবা আসে যায় ?
এই প্রশ্ন হয়তো বা অর্বাচীন নয়,
তবু মনে হয়
সত্যই সার্থকনামা করুণানিধান,
দয়ার ভাণ্ডার তাঁর প্রাণ ;
সেই কাব্য-সরস্বতী-তনয় স্মরণে
শতবর্ষে সহস্র প্রণাম।

এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউসনের ছাদে বৈকালী সাহিত্যবাসরে উপবিষ্ট দক্ষিণে দ্বিতীয় আসনে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
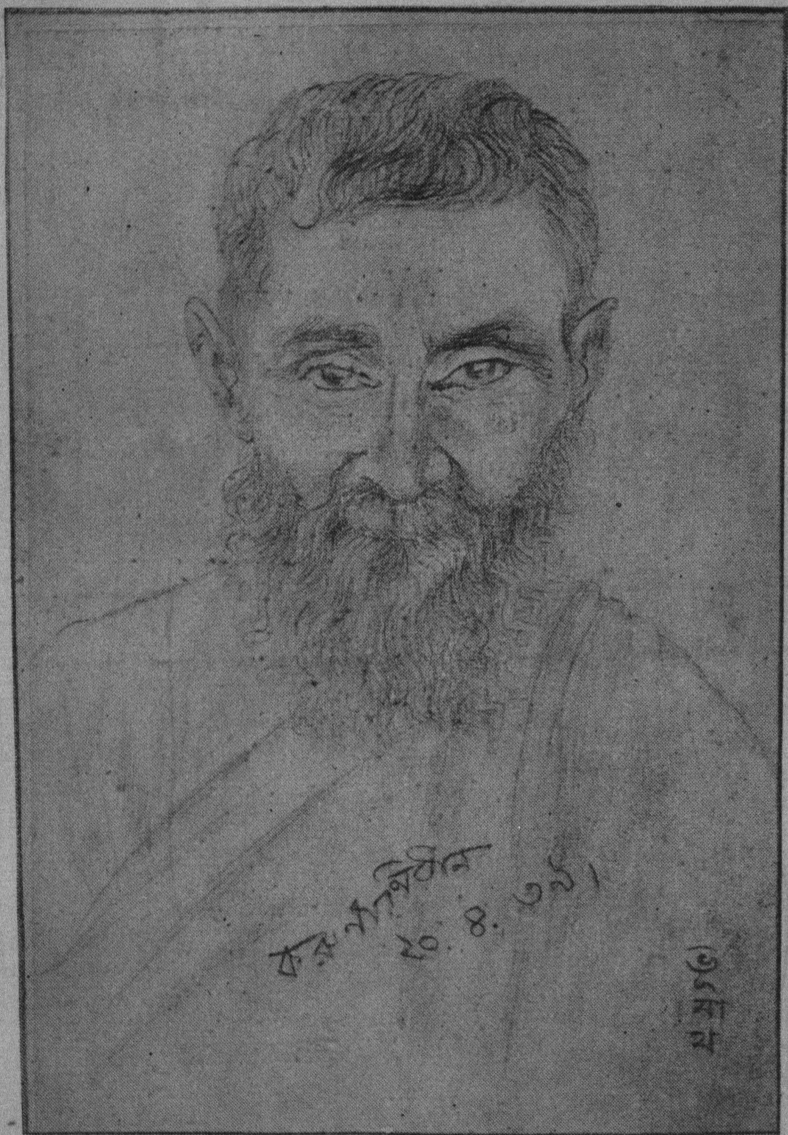
কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ভূনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত রেখাচিত্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি কবি করুণানিধান-জন্মশতবর্ষে

বনফুল

তুমি স্রষ্টা,
তোমার সৃষ্টি অনন্য অনবদ্য।
তুমি দ্রষ্টা
তোমার দৃষ্টি স্বকীয়তাময় সত্যদর্শন।
পুরাতন সেই আকাশে বাতাসে ফুলে
পুরাতন সেই সত্য মিথ্যায়, ভুলে
পুরাতন সেই স্নেহ প্রেম মমতায়
তোমার প্রতিভায়
ফুটেছে নূতন রূপ
তোমার সৃষ্টি তোমার দৃষ্টি
সত্যই অপরূপ।

তোমার জগতে রসিকের আনাগোনা
থাকবেই চিরকাল,
হবে না কিন্তু গড্ডলিকার ভিড়।
অধিকাংশ লোহারাই রাখে না
স্পর্শমণির খবর।
পেয়েছিনু তব স্নেহ
সে গর্ব মোর আকাশচুম্বী আজও।
সরস্বতীর নূতন বার্তাবহ
লক্ষ প্রণাম লহ।

২

আজ তুমি বহুদূর
তোমার স্মৃতির পটে
বেঁচে আছে শুধু
রস-রূপ-সুর
অতি সুমধুর।
বেঁচে আছে স্বপ্ন-সম্ভাবনা
রসিককে করিয়া উন্মনা
আজও তব কাব্য-তীর্থে
পাই কত অমৃতের কণা,

আর পাই যাহা নিত্য
চরিতার্থ হয় চিত্ত
হই হৃষ্ট-মনা।
ওগো কবি স্বপ্ন-লীন
আজও বাজে তব বীণ
চির অভিরাম—
মহ কবি, ভক্তের প্রণাম।

কবি করুণানিধানের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সকলেই পথে চলে, তবু কিছু ভঙ্গির তফাতে
বিশিষ্ট চিহ্নিত হয় এক এক পথিক।
প্রকৃতপ্রেমিক তুমি ছিলে আর সকলের মতো,
রবীন্দ্রনাথের পথে অনায়াসে নির্দ্বিধায় চলতে চলতে
স্বল্প স্বাতন্ত্র্যের পুঁজি করেছো অর্জন।

রূপমুগ্ধতার আবেশে তন্ময়,
সৌন্দর্যের ব্যাকুল আহ্বানে তুমি ছোট অভিসারে,
রূপের সায়রে ডুবে তুমি রূপকেই ধরতে চেয়েছো।
রূপতন্ময়তায় তাই তুমি মরমী বাউল কবি।

দিন তার রঙ দিয়ে তোমার দু চোখে আঁকে কি মায়াবরণ,
রাতের জ্যোৎস্নাও রচে কি আড়াল অপরূপতার;
কল্পনার আতিশয্য তোমাকেও ছুটিয়েছে
ভক্তি-ধর্মাশ্রিত পথে তীর্থে তীর্থে রূপানুসন্ধানে।

আজ এই ইতরতা কোলাহল অবক্ষয় রুক্ষতার মাঝে
তোমার সৌন্দর্য-সত্তা মনে জাগে,
স্বপ্নমুগ্ধ রূপলুব্ধ কবিকে জানাই শ্রদ্ধা,
আনত প্রণাম!

কবি করুণানিধান

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাণীর কণ্ঠে দিয়েছ রতনের শত-নরী,
শত বর্ষের আলোকে আমরা তোমাকে স্মরণ করি।
তোমার জীবন, তোমার কবিতা গঙ্গা-জলের মত
অতি পবিত্র, স্নান করে তাই ভক্তেরা শত শত।
তুমি চিরদিন সাধনা করেছ নীরবে সরস্বতীর,
প্রত্যূষে ছিলে বাগানের মালী, পূজারী সন্ধ্যারতির।
শান্তিপুরের সোনার মাটিতে লুটিয়েছ কৈশোরে,
নীলাম্বরীর স্বপ্ন দেখেছ আয়ুর দ্বিপ্রহরে।
সমুদ্র থেকে নভোমণ্ডলে তোমার পরিক্রম ;
শ্রীক্ষেত্র থেকে হিমাদ্রি-শিরে যেতে কি হয় নি শ্রম !
কবি জয়দেব চণ্ডীদাসের আত্মার আত্মীয়,
বৃন্দাবনের লীলাময় তাই ছিলেন তোমার প্রিয়।

ছিলে দয়াময়, তাইতো তোমার করুণানিধান নাম,
শতবর্ষের স্মরণে আমরা তোমাকে করি প্রণাম॥

করুণানিধান জন্মশতবর্ষে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বিষণ্ণ কালের ঘোর বিদ্রোহের বহ্নিব্যূহে তুমি
প্রবিষ্ট হওনি কবি। স্বপ্নাবিষ্ট রূপমুগ্ধতার
তন্ময় দর্শক ছিলে, ভাবলোকে পরিব্রাজনার
মায়াঞ্জন ছিল চোখে। রক্তস্নাত সে যুগ-মৌসুমী
কণ্ঠে যার ছিল ক্ষুব্ধ অনিরুদ্ধ ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার,
সে জ্বলন্ত যুগে তুমি হে মরমী ছিলে নির্বিকার
আত্মস্থ স্বাপ্নিক প্রেমে। পুষ্পিত বিজন বনভূমি
অনুরাগ-রসোল্লাসে মর্মরিত হৃদয় তোমার।

অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঢাকা কুহু-ডাকা বসন্ত-বাতাসে
ছন্দিত রোমাঞ্চঘন বিহ্বল ব্যাকুল বাসনায়
অ ধরার ধরা পেতে অভিসারে ইঙ্গিতে আভাষে
হৃদয়-সারঙে সুর তুলেছ মদির মূর্চ্ছনায়।
কাব্যের হীরকদীপ্র রেখে গেছ 'শতনরী' হার
বাণীকণ্ঠে দোলে জন্ম-শতকের আত্ম উপহার।

করুণানিধান

সুশীল রায়

আমাদের এ জীবন হাসি আর হাহাকারে ভরা
তোমার জীবন কিন্তু বস্তুতই পরিপূর্ণ করা
ছিল প্রেম-ভালোবাসা-করুণায়। প্রত্যহ আমরা
তোমাকে স্মরণ করি এই মিথ্যা না বলেও বলি
তোমাকে স্মরণ করা, পুঞ্জীভূত করা শ্রদ্ধাঞ্জলি
আমাদের করণীয়। জন্মশতবর্ষ পূর্ণ করে
এখন রয়েছ কাছে, আজ সমবয়সীর মতো
আমাদের পাশে পাশে। এই ভাবে বহুকাল ধরে
ফুলের মতন ফুটে থাক্ কাব্যকুসুম সতত
বঙ্গের উদ্যানে, তুমি সেই পুষ্পসম্ভারে নিজেকে
গিয়েছ বঙ্গের ঘরে-ঘরে যেন সগৌরবে রেখে।
তোমাকে স্মরণ করা হয় যেন আমাদের অন্যতম ব্রত।
নিজের কীর্তিকে রেখে যাওয়া—বিধাতার এই তো বিধান
তুমিও গিয়েছ রেখে সেইমত স্বীয় নাম, করুণানিধান।

কবি করুণানিধান স্মরণে

বিভা সরকার

নামে তব পরিচয় করুণানিধান পূতধারা গঙ্গা যেন তব কাব্য কবি,
শান্ত শ্যাম পল্লীবাটে জনগণ মনে তোমারই ও হৃদয়ের প্রাণময় ছবি!
রবি দীপ্তি নাহি থাক— চন্দ্রমার শান্ত কান্ত মধুময় রূপ,
চিরন্তন পথ ধরি তুমি অন্যমনা, প্রকাশিয়া গেছ শুধু শাশ্বত স্বরূপ।
বাংলা মার আপনার কোলের দুলাল, ধূলার গুলাল মাখি চিরতৃপ্ত তুমি।
ভোরের প্রশান্ত পাখি মধ্যাহ্নেও গেছো ডাকি গৃহের তুলসীমঞ্চে গিয়েছ
—প্রণমি।

বিতর্কের ঘূর্ণি নাই প্রাণের পূজারী স্বচ্ছতোয়া ধারা সম তোমার জীবন,
প্রাণের ঠাকুর ছিল মাধুরী বিলায়ে প্রেম সেবা পূজা নিয়ে ভরা এ ভুবন!
দেবতার আশীর্বাদ তোমার জীবনে ভালোবাসি ছিল যেন সদাই জাগিয়া
ধন্য করি আপনার মানব জনম— শ্রদ্ধা প্রেম আর ভক্তি লয়েছ মাগিয়া।
রাজৈশ্বর্যে কিবা কাজ তুমি অন্যমনা পরম ঐশ্বর্যে ভরি লয়েছ হৃদয়।
জীবন সফল তব তাই ওগো কবি, অমৃতের ছোঁয়া পেয়ে মৃত্যু মধুময়।

শান্তিপুরে পাঁচুই অঘ্রাণ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

মাথার ওপরে নীল আকাশ উপুড়
আমার পায়ের নীচে ভিজে পলিমাটি।
নদী-প্রান্তরে আজ একটানা হাঁটি,
একটানা—সকাল, দুপুর।
শান্তিপুর, আর কত দূর।

হেমন্তের দিন শেষে, চাঁদ ওঠে রাসপূর্ণিমার।
আমি এক তীর্থযাত্রী—বাংলা কবিতার
অন্যতম রাজধানী সে মহানগরে,
ডাকেন করুণা করে
একবার যদি কবি করুণানিধান!

আজকে তারিখ কত? কতই অঘ্রাণ?
ঋক্ সাম যেমন প্রাচীন,
পাঁচুই অঘ্রাণ নাকি করুণারই—অন্য জন্মদিন?
করুণানিধানও সেই কবি
এখনো যে নামে ফোটে টগর করবী
ঘরোয়া বাঙালীর আঙিনায়।
করুণার নীলধারা গঙ্গা বয়ে যায়—
ছড়ায় পদ্মায়, মেঘনায়।

করুণানিধান
যথার্থই নদীয়ার নদীর সন্তান।
একশো বছর পরে
গৌড়জনের তৃষা মনে-প্রাণে এখনও মেটান।

পাঁচুই অঘ্রাণ।
তীর্থযাত্রী ছুটে যাই তাই শান্তিপুর।
সে বিখ্যাত জনপদ কত দূর? আর কত দূর?

কবি করুণানিধানকে নিবেদিত

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বিশ্ব-প্রকৃতি ছাখো আপনার মনে হয়ে ওঠে,
তরু-লতা জীব-জন্তু ফুল-ফল অরণ্য-সাগর-নদী আকাশ পৃথিবী !
ফুল ফোটে, ফল হয়, নদী চলে, শিশু হাসে, সূর্য-চন্দ্র নক্ষত্রেরা ওঠে
একে একে নীলকান্ত নীল নগ্ন আকাশের গায় ।
মানুষ তবুও কত সব মেনে, সব ফেলে, সব কিছু উপেক্ষা করে সে বিপ্লবী
হয়ে ওঠে বার বার, হয়ে উঠেছিল ! তাই সভ্যতার সমস্ত প্রাসাদ,
সব কিছু সঞ্চয় !···
কত আয়োজনে, কত প্রেমে, কত যত্নে তবু সে বাজায়
প্রত্যহের স্বরলিপি । নিজেই রচনা করে, নিজেই সে ছাখে চোখ মেলে ।
কেউ কেউ মনে করে সবার পিছনে আছে ঈশ্বরের হাত !
অস্তির প্রসঙ্গে এত আশ্চর্য বিশ্বাস
হৃদয়ে লালন করা এ আজকাল এই যুগে কদাচিৎ মেলে !
তোমার কবিতা শুধু ছুটি চোখ মেলে চেয়ে দেখা আর দেখা
শিশুর বিস্ময় নিয়ে রূপ-রঙ্-রহস্যের অতি অন্তরালে
বার বার আসা যাওয়া । মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের ব্যথা
বুকের ভিতরে এসে ঢেউ তোলে, পাড় ভাঙে !···
অথচ কখনো তুমি একা
ফুলের মতন সিক্ত অলৌকিক প্রভাতের নির্জন শিশিরে ।
বিলাবলে বেজে ওঠে অন্য সুর ! এবং ক্রমশঃ অস্ত প্রসন্ন পবিত্র নীরবতা
তোমাকে আবিষ্ট করে, তোমার সর্বাঙ্গে যেন ছায়া ফেলে,
ঘুম পাড়ায় শিশুর মতন ধীরে ধীরে ।···
সহজ সচ্ছল সব—অথচ আবিশ্ব কী যে বিধি-নিয়মের
ছয় ভাগে পরিশ্রুত চারিদিকে অপরূপ আশ্চর্য রচনা ।
সুন্দরের সাহচর্যে জেগে ওঠে সত্য, কল্যাণ ।
জীবন, জীবনাতীত একই সঙ্গে রয়ে গেছে : সব নিয়ে
আবিষ্ট এ জীবনের অব্যর্থ যোজনা—
সব নিয়ে হয়ে উঠছে আকাশ-পৃথিবী—এই সমাজ সংসার ।
সাহস-সাধনা-প্রেম, আঘাত-ব্যর্থতা দুঃখ, আকাঙ্ক্ষার প্রতিযোগিতায়
সমস্ত প্রকাশে একই সত্যের উন্মোচনা—একটিই উদ্যান
অপরূপ হয়ে উঠছে : তোমার কবিতা এই বিশ্বাসের আশ্চর্য ঘোষণা ।
তোমার প্রশান্ত সেই বিশ্বাসের পথ ধরে সৌন্দর্যের অতি অন্তঃপুরে

আমরাও যেতে চাই। কিন্তু পারছি না আর। তোমার ঐ আশ্চর্য সুরের বিজ্ঞান
আমরা যে ভুলে গেছি। আমাদের ত্রিশঙ্কু বুকের ভিতরে
নরম জলের মতো তবু সে বিপন্ন ব্যথা—অসহায় ব্যর্থতা কাঁদে ঘুরে ঘুরে!
তোমাকে এখনো মনে পড়ে॥

'আজি হতে শতবর্ষ আগে' কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

মায়া বসু

একশো বছর আগে সে যে, অনেক দিনের আগে,
কি গান তুমি গাইলে কবি, গভীর অনুরাগে
রবির আলো দীপ্ত তখন, দিক-দিগন্ত নীল গগনে,
একটি ছোট দীপের শিখা, জ্বাললে মাটির ঘরের কোণে।
সেই আলোতে মিলিয়ে গেল 'শান্তিপুরের' সব ম্লানিমায়,
উজল সলিল, আকাশ কানন উষার সরস অরুনিমায়।

ফুলে নবীন কিশলয়ে ছাওয়া তোমার কুটির হতে,
ছুটলে তুমি ধান নাচানো, সবুজ মাঠের আলের পথে।
ছড়িয়ে দিলে সুরের ধারা, গ্রামনদীটির টলমলে,
ভাসিয়ে দিলে নৌকো তোমার ঝর্ণা-ঝালর গাঙের জলে।
মেঘের ছায়ায়, অলস মায়ায়, সেই তটিনীর তীরে তীরে,
ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙচিলেরা নাচলো তোমায় ঘিরে ঘিরে।

অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, যুগের যন্ত্রণা আর বিষণ্ণতা
সরিয়ে রেখে স্বভাব কবি, কইলে তুমি আপনকথা।
তোমার স্নেহে ধন্য হল দূর বিদেশের 'তামিল বালক'
দুহাত ভরে কুড়িয়ে নিলে সাগর-পাখির রঙিন-পালক
কদম কেশর কণ্টকিত, স্পর্শে তোমার, ভালোবাসায়,
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের বনে নিত্য তোমার যাওয়া আসায়।

সূর্য শিখায় হওনিকো ম্লান, আপন আলোয় উদ্ভাসিত
বনের মাঝে হঠাৎ ফোটা গন্ধভরা ফুলের মতো।
'ধানদূর্বা' 'প্রসাদী' আর 'ঝরাফুলে' 'শান্তিজলে',
বরণ ডালা সাজিয়ে দিলে, সরস্বতীর চরণ তলে।
একশো বছর পরও তুমি আছ সবার হৃদয় ভরে,
ধন্য হলাম, পূর্ণ হলাম— কবি তোমায় স্মরণ করে।

কবি করুণানিধান

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

রবি-পরিমণ্ডলের পঞ্চপুষ্পে শুভ্র শতদল
সত্যেন্দ্র, সত্যের শ্বেত আভা যার অতি কমনীয়।
নাগকেশরের গন্ধে মকরন্দ সর্বদা চঞ্চল
যাঁর কাব্যমালঞ্চের, যতীন্দ্রমোহন তিনি প্রিয়।
কুমুদ অব্যর্থনামা, পল্লী যার শোভায় উজ্জ্বল
ভক্তির চন্দন-স্পর্শে পরম শরম রমণীয়;
কদম্বের গন্ধভাসে পর্ণপুটে একান্ত বিহ্বল
যে কবির কাব্যে তিনি কালিদাস বৃত্য, বরণীয়।
তুমি সেথা স্বর্ণচাঁপা গন্ধে বর্ণে সমান কুশলী,
কখনো গ্রীষ্মের সন্ধ্যা ভরে তোল গন্ধের নূপুরে
কখনো শরতে ভোরে আন্দোলিত তোমার অঞ্জলি
রূপের অরূপ তানে, প্রতিধ্বনি আসে ঘুরে ঘুরে
স্বর্ণরসনার তালে সকরুণ ভৈরবীর সুরে
করুণানিধান-বাণী দিগন্তের পারে যায় চলি॥

শতবর্ষে কবি করুণানিধান

বেলা দেবী

আবার নূতন করে দেখছি তোমাকে
তোমার জন্মশতবর্ষের আলোয়
মরমী দরদী কবি করুণানিধান!
আবার স্মৃতির ধূপ এ হৃদয় ছোঁয়।

আবার দেখছি খুলে তোমার কবিতা
দেশপ্রেমে উদ্দীপিত সে 'বঙ্গমঙ্গল'
এখনও ছিটোও তুমি তৃষিত হৃদয়ে
সুনির্মল কবিতার স্নিগ্ধ 'শান্তিজল',
পেয়েছো 'প্রসাদী' ফুল সাহিত্যলক্ষ্মীর
পরিয়েছো কণ্ঠে তার 'শতনরী' হার
ফোটালে কবিতাকুঞ্জে 'আনন্দ বকুল'
মালা গাঁথলে 'ঝরাফুল'এ কবি মালাকার।

'ধানদূর্বা'ও আছে তোমার সাজিতে
সাহিত্যে সাত্ত্বিক তুমি শুদ্ধ নিষ্ঠাবান
শতবর্ষে শতদীপে নূতন এষণা
দরদী মরমী কবি করুণানিধান!

কবি করুণানিধানকে

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কল্পনা-কালিন্দী-তীর্থে ললিত মধুর গীতি লীলায়িত মনে
প্রকৃতি-পূজার কবি নির্জনে নৈবেদ্য হাতে অঘ্রাণের বনে
এনেছ অপরাজিতা। বাসন্তিক পৃথিবীর ফোটা ফুলে ফলে
পাহাড়ে প্রান্তরে প্রেম রূপে বর্ণে অনুভূতি ধারা-ফল্গুজলে।
তালীবনে তমালের গেরুয়া মাটির শুনি একতারা গান
তোমার সংগীতে হ'ল নিত্য গাওয়া, সাঁঝে সাঁঝে দীপ-অর্ঘ্যদান,
তুলসী মঞ্চের চকে। জীবন সৌন্দর্যে নিত্য বুঝি 'শান্তিপুর'—
ছন্দে ভরে পদাবলী ধৈবত ও গান্ধারের নিরুদ্ধ যে সুর;
স্নিগ্ধ সৃষ্টি 'শতনরী'। ঝর্ণারই রূপালী তরল জল ঝারি,
হৃদয়ে সুষুপ্ত স্বপ্ন, 'ধানদূর্বা' 'শান্তিজল' নিয়ে দেয় পাড়ি
আকাশ সুনীল প্রেমে, মন তবু মাটি ভেজা সবুজের ঘাসে
মাঘের শিশিরে মিশে প্রকৃতির আশ্বাসের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—
এ শাশ্বত পৃথিবীর 'গীতায়ন', 'প্রসাদী'র দিলে 'ঝরা ফুল'
করুণানিধান-মন—স্নেহ দিয়ে ভালোবেসে মানুষের কুল।

করুণানিধান

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিসর্গশোভা মরমী শিল্প-তুলির টানে
অক্ষয় ক'রে রাখে নি তো আর কেউ, হে কবি!
তব রূপলোক রসের ধেয়ানে মগ্ন ছবি
সুন্দরতার ভাবতন্ময় গহীন প্রাণে।
রমণীর বিভা গৃহদীপনিভা তোমার চোখে
দেহাতীত সেই রূপের আরতি মর্মলোকে
প্রেম-অর্ণবে হৃদ্‌তরী তব চিরভাসমান
বিরহ-মিলন শতনরী-হার সদা অম্লান।
'জগৎ প্রাণের' অন্বেষণে যাত্রা অজানায়
তোমার, কবি, দোসর খুঁজে 'পথ-ফুরানর দেশে'
ভক্তি এবং বিশ্বাস তব চিরসুন্দরে মেশে
কাটে অনুখন 'পাপড়ি খসে পড়ার' প্রত্যাশায়।
তুমি প্রকৃতির, তুমি প্রণয়ের, তুমি কবি সুষমার
স্বপ্নাবেশের অধ্যাত্মের কবি! নমি বারেবার॥

অকৃত্রিম করুণানিধান

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর্ব অভাবনীয় সেই সম্মেলন,
সেই শুভক্ষণ।
সারস্বত অঙ্গনে তখন অসামান্য সমারোহ :
পুষ্পে পত্রে বিকশিত স্মিত মায়া, মোহ
উদার উদ্যানে—
রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে ছন্দে গানে।
এবং, তখন জ্যোতির্ময় মহাকাশ ;
লীলায়িত আলোর বিলাস
সদরে অন্দরে, স্থলে জলে, পর্বতে প্রান্তরে পথে।
জ্বলে সূর্য। উজ্জ্বল শপথে
অবিরল অনর্গল রজত-নির্ঝর যেন ঝরে।
সাত রঙে অপরূপ এক রূপ ধরে ;
সাত রথ, কিন্তু এক রথী
অথবা সারথি ;
সাতটি ডিঙায় ভাসে শুচিশুভ্র এক সওদাগর।
আর, তার চারপাশে সুনীল সাগর
ফেনিল তরঙ্গরঙ্গে।
স্নিগ্ধ নীলিমার অঙ্গে অঙ্গে
ইতস্তত শ্বেত স্বচ্ছ মেঘের বলাকা
মেলে লঘু পাখা
মালা গাঁথে দীপ্ত সৌরমণ্ডলের অধিদেবতার,
তৃপ্ত থাকে পেয়ে স্বাদ প্রসাদকণার।
মধ্যমণি একটি বিগ্রহ,
তাকে ঘিরে চক্রে ঘোরে কয়েকটি গ্রহ-উপগ্রহ।
অনুরক্ত কিছু ভক্ত ইতিমধ্যে কক্ষে স্থিত হয় ;
সৃষ্টির কৃষ্টিতে কাঁপে যে আত্মপ্রত্যয়
কোনো কোনো কৃতী অনুজের,
কৃতকাম ভাস্করের
রীতিমত ভাস্কর্যের বাড়ে তাতে আরও বেশি দাম।
করুণানিধান সেই ধন্যদের অন্যতম নাম—
কাব্যের নিধান যার করুণায় ভরা,
অকৃত্রিম; শতকের সীমান্তেও নেই জরা।

কবি করুণানিধান

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গের মঙ্গলমন্ত্রে আত্মহারা ভাবমুগ্ধ কবি
জীবনে সাক্ষাৎ নাই হোক !
অন্তরে অঙ্কিত যেই ছবি—
সে ছবি সার্থক হল—শান্তিপুর-ধামে গিয়া,
তব কক্ষে গেলা যবে দীন এই তীর্থ-পর্যটক।
ধানদূর্বা শান্তিজল ঝরাফুল সুবাস ছড়ানো
মাঠে মাঠে, মঠে মঠে, বনে-বনে প্রান্তর ছায়ায়
আসীন তোমার সত্তা দরদী গো শোভন কায়ায় !
শুরুর প্রজ্ঞা ভূমে মাধুর্যের অঙ্কুর ছড়ায়ে
যারা সব ফসল ফলালো,
গুরুমুখী প্রজ্ঞা দিয়ে আপনার মর্মকে জড়ায়ে
কবিতার বরফ গলালো ;
সাগরের তলদেশ অনুভূতি দিয়ে করিল মন্থন,
তুমি যে তাদেরই একজন।

শতবর্ষের প্রণাম

প্রদ্যোতকুমার মিত্র

শতবর্ষের লহ গো প্রণাম, হে কবি করুণানিধান !
ধন্য যে নাম, ওগো গুণধাম, গাহি সবে তব জয়গান।
আজ শুভক্ষণে নবগৌরবে
ভরে গেলো ধরা তব সৌরভে,
তাই গরবিত ভবে সুধীজন সবে
তোমায় করিয়া মানদান।

তুমি বরণীয় বর কবিগণ মাঝে মরমের মরমীয়—
অযুতজনের মনের গহনে তুমি চিরস্মরণীয়।
হে নিখিল প্রিয়, হে চিরনবীন,
মহামহিমায় আছো সমাসীন,
তুমি প্রকৃতির কবি, মানবদরদী,
মহাজ্ঞানী আর মহাপ্রাণ।

'শতনরী'র কবিতা কি ভাবে মুগ্ধ করে

পরিমল চক্রবর্তী

দেখেছি বাউল এক দুই-চক্ষু কানা—
দিন রাত গান গায় তা-রে না-না-না না ;
সে-গানে সুরের ঝড় অথবা সে-মায়া
তেমন কিছু তো নেই, তবু তার ছায়া
কি-প্রশান্ত আবেগের গাঢ় স্বপ্ন আনে
হৃদয়ের সুগহনে ! শপথের টানে
চেতনায় মেঘনায় কত ঢেউ-ভাষা
জেগে ওঠে, প্রাণে কাঁদে কত দীপ্র আশা !
তেমনই আমার কাছে 'শতনরী'-গান
পরম মাধুরী মাখা; উদাস সে-তান
আমাকে উতলা করে, করে আর্ত, মুগ্ধ—
এ-সুরের স্পর্শ পেলে জীবনের ক্ষুব্ধ
ইচ্ছেগুলি ঝ'রে যায়। আনন্দের ঝড়
জেগে উঠে ধন্য করে বিষণ্ণ প্রহর ॥

পল্লীপ্রেমিক করুণানিধান

তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন-সবুজ দিগন্ত ঢেউ ধানের শিষের মায়া
বট-অশথের শত অলিন্দে জ্যোৎস্নার আলোছায়া।
নীল আকাশের প্রাঙ্গণতলে স্বচ্ছ-ফটিক পুকুরের জলে
মরালীর পিছে সোহাগের ছলে মরালের ধেয়ে যাওয়া !
সে সুখের রেশ জাগাত আবেশ, হে কবি তোমার প্রাণে—
রচিত ছন্দে রূপে রসে ভরা কত ছবি অনুমানে !
মাটির মানুষ, সরল জীবন, কাদা-মাটি মাখা প্রাণ—
ভালোবাসা পেয়ে তোমার কাব্যে উজ্জ্বল অম্লান।
নদী-নির্ঝরে বেতসের বনে তোমার সে প্রাণ আপনার মনে
উদার প্রকৃতি মুক্ত বাতাসে সহজ জীবন স্বাভাবিক শ্বাসে
ছন্দ খুঁজিয়া ফিরিত সদাই উল্লাসে ক্ষণে ক্ষণে
হাতেতে সুডোল রাখালিয়া বাঁশি, মনে ছিল কত সুর—
তাই নিয়ে তুমি ছিলে বিহ্বল আনন্দে ভরপুর।
পল্লীর প্রতি ধূলিকণা যোগে তোমার মুক্তি-স্নান—
প্রদোষ-প্রাতের ছায়া-রোদে ঘেরা পল্লী তোমার প্রাণ !

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

নানা ধরণের মানুষ, নানাভাবে আমাদের স্মৃতির পটে ছাপ রেখে যায়। কেউ কেউ আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্তরলোকে প্রবেশের পথ করে নেয়, কেউ বা নিজ কৃতকর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে উঠে মনে দাগ কেটে যায়। আবার এমন মানুষও দেখা যায় যারা এই দুটি সম্পদের একটিরও অধিকারী নয়, কিন্তু তথাপি তাদের ভোলা যায় না। এরা মনের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে, মনের কোন এক অজ্ঞাত দ্বারের ভিতর দিয়ে একেবারে অন্তরের মধ্যে স্থান নেয়। করুণানিধান নিজ কবি-কৃতি প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীর অন্তরলোকে স্থান করে নিয়েছেন সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য এই যে তিনি এমন মানুষ ছিলেন যার সঙ্গে পরিচয় হলেই বোঝা যেতো যে তার চরিত্রে এমন একটা যাদু আছে, যার আকর্ষণ অনস্বীকার্য, যা কাছে টেনে নেয়। এই ভাবেই তাঁকে আমি জেনেছিলাম ও আজও জানি। প্রায় ষাট বছর আগের কথা কিন্তু সেই পুরোনো ছবি এখন অনেকাংশে অমলিন রয়ে গেছে।

করুণানিধান দীর্ঘ-দেহী কৃশকায় মানুষ ছিলেন। গায়ের রং মলিন শ্যামবর্ণ। তাঁর স্বল্প শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডলের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় কিছু ছিল না। কিন্তু প্রথম তাঁকে যখন দেখি তখনই মনে হয়েছে এই মানুষটি যেন অন্য সব মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম একটা বই-এর দোকানে, তখন পরিচয় হয় নি। তিনি বই দেখতে নিমগ্ন। দোকানে একাধিক সারিতে আলমারী সাজানো থাকার দরুন যেখানে করুণানিধান বই দেখছেন সেখানে আলোর স্বল্পতার জন্য প্রায়ান্ধকার। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পুস্তকালয়ের মালিকের হঠাৎ খেয়াল হলো যেখানে করুণানিধান বই দেখে চলেছেন, সেখানকার আলোটি জ্বালানো হয় নি। তিনি আলোটি জ্বালিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে করুণানিধান পুস্তকালয়ের মালিকের কাছে আলোটি জ্বালিয়ে দেবার জন্য অল্প দু-চারটি কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। স্মিতহাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেদিন ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নি। তখন আমি একজন ছাত্র মাত্র। প্রথম পরিচয় হয় এই ঘটনার দুবছর পরে বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচীর সৌজন্যে। কবি করুণানিধান ও সতীশচন্দ্র বিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন। সতীশচন্দ্রের কাছে শুনেছি যে কবি অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে সুরু করেন। করুণানিধান তখন বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজের মেস সমূহের পরিদর্শক বা ইন্‌স্পেক্টর। বস্তুতঃ সতীশচন্দ্রের সুপারিশে স্যার আশুতোষ করুণানিধানকে ঐ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯১৯-২০ সালের কথা বলছি। তখন করুণানিধান কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। নানা

পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু সতীশচন্দ্র ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তখন সাহিত্যরসিক সমাজে সতীশ-চন্দ্রের 'ফরাসী গল্প' বইখানি সমাদর লাভ করেছে। দুই বন্ধুতে সতীশচন্দ্রের বাড়িতে সাহিত্য-আলোচনা চলতো। দুজনের লেখাও মাঝে মাঝে পঠিত হতো।

একদিনের কথা মনে আছে। কবি কয়েকদিন পূর্বে তাঁর একটি কন্তাকে হারিয়েছেন। বেদনামথিত চিত্তে কবি তাঁর হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ করলেন একটি হৃদয়দ্রাবী কবিতায়। এই কবিতাটিতে কবির মর্মভেদী করুণ হাহাকারের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র লীলা মিশ্রিত হয়ে এক অপরূপ আবেগের সৃষ্টি করেছে। কবিতাটি পড়তে পড়তে সেদিন করুণানিধান অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি।

ওই যে ওখানে অভ্র-রজত স্রোতটি বহিয়া যায়,
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালী লুকায়েছে বালুকায়।
একেকটি করে তারা জলে জলে
চাঁদের রূপালি হাসে পড়ে ঢলে
কাঁদে গো তটিনী ছল-ছল-ছলে অফুরাণ বেদনায়।

দরদী কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন—'শেফালী' শীর্ষক কবিতায় বালিকার মৃত্যুতে কবি যে শোক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও এই প্রকৃতির মাধুরী করুণ সুন্দর হইয়া যে রস সঞ্চার করিয়াছে, তাহা ইংরাজি যে কোনো উৎকৃষ্ট Dirge কবিতার অনুরূপ।'

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতি তৎকালীন রোমান্টিক কবিদের ন্যায় করুণানিধান রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্যতম তারকা ছিলেন। এই কবিগোষ্ঠীর সৃষ্টি-সৌন্দর্য-বিভোরতা, ভাষা বৈচিত্র্য, ছন্দমাধুর্য ও প্রসাদগুণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দ্বারা রসিকসমাজে সমাদর লাভ করে। করুণানিধানের কবিতাসংগ্রহ 'শতনরী'তে যে সব সুনির্বাচিত কবিতা স্থান পেয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে এই গুণগুলি করুণানিধানের কবিতাকেও এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। আমাদের ছাত্র বয়সের প্রায় শেষ পর্বে আমরা উৎসাহের সঙ্গে করুণানিধানের 'স্বপ্নলোক' কবিতা পড়েছি। এই কবিতাটি শব্দঝঙ্কারে, ছন্দো-মাধুর্যে ও কল্পনা-সুষমায় সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাসম্ভারের সমপর্যায়ের বলে মনে হতো।

হেথায় তারা নাইতে নামে ভাসিয়ে তন্বী জ্যোৎস্না মাঝে
গিরিদরীর মুক্তধারা নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন ঝালর ধূসর পাষাণ-সিঁথির তটে—
অস্ফুট ভাবে পথের পাশে ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।

তাদের চুলের ফুলের বাসে গন্ধ হারায় গোলাপ, বেলা—
কে অপ্সরী সারঙ্ বাজায়, কি অপরূপ সুরের খেলা!
নিশীথ রাতে রাখাল ছেলে চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের গুঞ্জরিছে গিরির কোলে;
তন্দ্রা ভেঙে দেখে তাদের—দূর আকাশে মিলিয়ে যায়
পাখায় ঝরে সোনার রেণু জ্যোৎস্নামাখা মেঘের গায়।

করুণানিধানের একটা কবিতাংশ আমার মনে এখনও গাঁথা হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই পংক্তিটি কোন কবিতায় সন্নিবিষ্ট তা আর এখন মনে নেই। একটি মাত্র পংক্তিতে করুণানিধান একটি সম্পূর্ণ, অনবদ্য ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। 'মেঘে আঁকা তরুর শিরে ছিন্ন আলোর পিচকারী'। এই চিত্র-কল্পটির শব্দ-ব্যবহার-সংযম ও সৌন্দর্যবোধ অনির্বচনীয়।

যখন ছাত্র ছিলাম তখন শুনেছি করুণানিধান সারা জীবন, বিশেষতঃ শেষ জীবনে, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর পরিবার তাই অভাব-অভিযোগ-মুক্ত ছিল না। দারিদ্র্যের সঙ্গে পারিবারিক শোক মিলিত হয়ে কবিকে নিষ্পেষিত করার প্রয়াস পেয়েছে। এই কারণে কবির সৌন্দর্য বিভোরতা শেষ জীবনে একটি মিষ্টিক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। 'শেষ' শীর্ষক কবিতায় তার স্বাক্ষর রয়েছে।

কারা যেন আসে সরে
অশ্রুকণা বিদ্ধ করে— চোখে পড়ে মুখের আদল;
নিবন্ত চাঁদের ফালি
গলে পড়ে জ্যোৎস্না কালি প্রহরেরা ছায়ায় পাগল।

কবি আরও লিখেছেন—

পূর্ণিমার কোন পারে
ডাকে যেন কে আমারে লুপ্ত অজগর রাত্রিরূপ;
মৃত্যু সে চুমকি প্রায়
ঝিক মিকি নিবে যায়, প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ।

দীর্ঘ ষাট বছরের কুহেলিকাচ্ছন্ন স্মৃতির পর্দায় যে ছবি আঁকা আছে, তাকে উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য। ভুল ভ্রান্তি সহজেই স্মৃতিকে খণ্ডিত করে! তথাপি যখন আমার কলেজ-জীবনের প্রিয় কবিদের কথা মনে করি, তখন যে সব স্মৃতি চোখের সামনে ছায়াচ্ছন্ন চলচ্চিত্রের মতো দেখা দেয়, তার মধ্যে করুণানিধানের অমর স্মৃতি অন্যতম।

সোনার খাঁচায় একটি সকাল কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে

আশীষ বসু

দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগের কথা। আমি তখন কৈশোরের শেষে, যৌবন ছুঁইছুঁই করছে। শীতের দেবদারু পাতা যেমন স্বল্প হাওয়ায় থির থির করে কাঁপে তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে আমার মনও তেমনি কাঁপতো। মফঃস্বল শহর শ্রীরামপুরে থাকতাম। কবি কাছেই থাকতেন ভদ্রকালীতে, জি.টি রোড থেকে দু পা। কোন্নগর ছাড়িয়ে উত্তরপাড়ার পথে।

শ্রীরামপুরের তিন নম্বর বাস তখন শহর কলকাতায় আসতো না।

বাসষ্টপে নেমে প্রথম যাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনিই আমাকে কবির বাড়ির ঠিকানা দিলেন। দেখা হল।

কবি এক ডাকেই বাইরে এলেন। —কী চাই বাবা?

—চাই আপনাকেই। অল্পকথায়ই আন্তরিকতা জমে উঠলো।

সুন্দর একতলা বাড়ি। দাওয়ায় সিমেণ্ট বাঁধানো। সামনাসামনি মাদুর বিছিয়ে দু'জনে বসলাম। সামনে একফালি বাগান। সিমগাছে সিম লতিয়ে পড়ছে। পাখি ডাকছে। কবির উপযুক্ত পরিবেশই বটে।

করুণানিধান খাঁটি বাঙালী মনের বাঙালী কবি। সাধাসিধে। সহজ কথার মানুষ। বললেন, পশ্চিমের কঠিন লাল মাটির ধারে ধারে শাল তমাল মহুয়া আর ইউক্যালিপটাস গাছের সার, ছোট ছোট টিলা আর তার মধ্যের আঁকাবাঁকা পাহাড়ী নদী আমাকে কবি করেছে। পঞ্চকোট পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ছোট্ট গাঁ গোবিন্দপুর আমার মনকে চিরকাল কবিতার খোরাক জুগিয়েছে। সেখানকার ক্ষুনিয়া নদীকে নিয়ে মনে মনে কত কবিতাই না রচেছি। কতদিন বিকেলে নদীটির ধারে গিয়ে বসেছি। মনে মনে গান রচনা করেছি। সূর্যের আলো এসে নদীর জলে পড়েছে। কতই না মনোরম সব সৌন্দর্য দেখেছি। বলতে বলতে বাক্‌রোধ হলো তাঁর। একটু থেমেই কবি আবার বলতে লাগলেন, কলকাতায় যখন 'জেনারেল এসেম্‌ব্লিস্ ইন্‌স্টিটিউসন্'-এ (বর্তমানে স্কটিশ) পড়ি, তখন আমি কবিতার মোহে পাগল। খাতা ভরিয়ে ফেলেছি নিজের লেখায়। মন ভরিয়ে ফেলেছি মাইকেল, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে। বলতে বলতে কপালে হাত ঠেকিয়ে যুক্ত-করে প্রণাম করলেন। তার পর ফের শুরু। কবিকণ্ঠে শুনলাম তাঁর বাল্যজীবনের কথা। তিনি বলে চললেন, শান্তিপুরে গিয়ে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়েছি প্রথমে। সেখানকার হাইস্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করে এলাম আবার জেনারেল এসেমব্লিস্ ইন্‌স্টিটিউশন্'-এ। এই সময়ে আমার কবি জানালেন, প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশিত হয়। তার পর 'প্রসাদী' 'ঝরাফুল' 'শান্তিজল'

'ধানদূর্বা' 'রবীন্দ্র আরতি' 'শতনরী' প্রভৃতি গ্রন্থ একে একে ছাপা হ'ল। কবি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন ভরা যৌবনেই।

তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষক। প্রথমে সরকারী ও বেসরকারী নানা স্কুল এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে কেটেছে বিশ বছরেরও বেশি। তিনি প্রায় ৭৭ বছর বয়সে মারা যান।

জিজ্ঞাসা করলাম কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা। আবার যুক্ত-কর কপালে। বললেন, সুধীন ঠাকুরের সঙ্গে সদ্য লেখা কবিতার খাতাটি নিয়ে ভয়ে ভয়ে একদিন হানা দিলাম তাঁর দরজায়। কয়েক মিনিটেই পরিচয় ঘটলো অন্তরের। নিজেই বললেন, কবিগুরুর সঙ্গে ছবি তুলেছি। সে ছবিতে কে কে ছিলেন জানো? চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন বাগচী, সত্যেন দত্ত, দ্বিজেন বাগচী, প্রভাত মুখোপাধ্যায় আর কবির ঠিক ডান পাশটিতে আমি। বলতে বলতেই শিশুর মতো ঘরে ঢুকলেন। ছবির কপি এনে দেখালেন। আরো বললেন, তাঁর কাছে লেখা নিয়ে গিয়ে কত সাহায্যই না পেয়েছি। আজকালকার কবিরা তো আর তা পেলো না।

একটি জনপ্রিয় মাসিকের পক্ষ থেকে তাঁকে ইণ্টারভ্যু করতে গিয়েছিলাম। আজকালকার কবিতার কথায় আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম বর্তমান কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারনার কথা। জানালেন, বর্তমান কবিতা সম্পর্কে আমি খুবই আশাবাদী। কবিতার সুর পালটেছে। কারণ দেশ কাল সমাজ ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। নবীন কবিদের কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। নতুন পালা শুরু হয়েছে। এটাই বাঞ্ছনীয়।

আমার ইণ্টারভ্যু যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কিছুদিন পরেই কবি মারা যান। মারা যাবার কয়েকদিন আগে তিনি আমাকে সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিলেন পোষ্টকার্ডে। সেই চিঠিটির মতো অমূল্যসম্পদ আমি হারিয়ে ফেলেছি। শ্রীরামপুরের বাস উঠিয়ে বড় শহর কলকাতার ভিড়ে এসে নিজেকে হারিয়েছি। কবিতা হারিয়েছি। কবির চিঠিটি হারিয়েছি। কবিকে হারিয়েছি। শুধু সেই সুন্দর সকালটির কথা আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বুকের মধ্যে কোথাও একটু থির থির করে কাঁপে।

কবি করুণানিধান। একটি পুণ্যস্মৃতি

শান্তশীল দাশ

কবি করুণানিধানকে আমি একবার মাত্র দেখে ছিলাম। সে-স্মৃতি মনের পটে আজো অম্লান হয়ে আছে। অনেকদিন আগের কথা। শ্রদ্ধেয় ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর দ্বারা পরিচালিত একটি সাহিত্যসংস্থা ছিল, নাম সাহিত্যবাসর। বিভিন্ন স্থানে এই সাহিত্য-বাসরের অধিবেশন বসতো। স্বরচিত গল্প কবিতা প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি ছিল মুখ্য বিষয়। কখনো কখনো কিছু গানও হত।

'ভারতবর্ষে' তখন সবে লেখার সুযোগ পেয়েছি। শ্রদ্ধেয় ফণীদা মাঝে মাঝে সাহিত্যবাসরের আমন্ত্রণপত্র পাঠান। যোগদান করি, কবিতা পাঠও করি। সাহিত্যক্ষেত্রে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

সাহিত্যবাসরের বিভিন্ন অধিবেশনে খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকেরা আসতেন সভাপতি হয়ে। আর সেখানে যোগ দিতেন অল্পখ্যাত ও অখ্যাতরাও। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটতো আনন্দে।

এমনিই এক অধিবেশনে এসেছিলেন কবি করুণানিধান বরাহনগরে এক বাড়িতে। সেখানে তাঁকে দেখার ও প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেই অধিবেশনে তাঁর 'শতনরী' থেকে একটা কবিতাও পাঠ করেছিলাম।

ঘটনাটি আজও মনে আছে।

গৃহের সামনে একটি ছোট চত্বর। সেখানে বসে আছেন কবি। প্রসন্ন মুখখানি। আশেপাশে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বর্ষীয়ান কবিকে প্রণাম করছেন এসে অনেকে। তিনি আশীর্বাদ করছেন স্মিত আস্যে।

সামনের উঠোনে শ্রোতাদের বসার জায়গা। ভিড়ও বেশ হয়েছিল। কবিকে দেখার জন্যে তো নিশ্চয়ই। আর সাহিত্যের আসরে যোগদানের ঔৎসুক্যও অনেককে টেনে এনেছিল।

সভার কাজ যথারীতি শুরু হল। কবিতা পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি। এরই মাঝে ছোটখাটো নানা কথাবার্তা।

সভাশেষে কবিকে প্রণাম করে বললাম একটি কাগজ বাড়িয়ে, কিছু লিখে দিন। কবি হেসে বললেন—কী লিখি এখন, কিছু-যে মনে পড়ে না। তার পর কলম দিয়ে লিখলেন কাঁপা-হাতে :

রথের কাছি ধরিয়া আছি
ধরমশালা ঘর,
পথিক মুখে তাঁরই শ্রীমুখ,
নহে তো কেহ পর।

যা দেন মোরে শ্রী ভগবান,
লইব সেই প্রসাদী দান ;
ভিক্ষাটনে কুণ্ঠা নাহি,

জয় প্রেম সুন্দর

লেখা শেষে সেই কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে নাম লিখলেন, কাগজটি তুলে দিলেন আমার হাতে। মাথায় ঠেকিয়ে সেটি পকেটে রেখে দিলাম।

সভাশেষে বাড়ি ফিরলাম।

কবিতার চরণ ক'টি গাঁথা হয়ে আছে মনে! কতবার কত প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উচ্চারণ করেছি এই চরণ কটি। আর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে ভক্ত কবির সেই প্রসন্ন মুখখানি।

জীবন ও কাব্যে কবি করুণানিধান

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কবিসত্তা শুভ্র-সুন্দর রজনীগন্ধার মতো সুপবিত্র অথচ সুগন্ধী। হাল্‌কা-সবুজ উদ্ধত বৃন্তে কত পুষ্পিত প্রকাশ—যেন প্রতিনিয়তই প্রকাশ-পিয়াসী।

এবং জানি কবিরা স্রষ্টার সম্মানে বিভূষিত। তাঁদের সৃষ্টির রূপ কবিতার ভাষা ও ছন্দে, ভাবে ও চৈতন্যে।

কবিতা সবিতার মতো ঋদ্ধ অথচ মর্মস্পর্শী। আবার প্রসবিত্রীও কারণ কবিতা আর সবিতা—মনন আর জীবনের একান্ত সৃষ্টির আর সমৃদ্ধির। আবারো বলা যায়—কবিতার শ্রী বোধের আর মনের এবং সবিতার দ্যুতি অনুভূতি আর অনুভবের।

একদিন আলোর জ্যোতির্ময় মূর্তিকে অভিনন্দনের অভিবাদনের উদ্দেশ্য নিয়ে মন্ত্রছন্দ রচনা করেছিলেন আদি যুগের কবি। সেদিন অন্ধকার থেকে আলোর উত্তরণের অভীপ্সায় রোমাঞ্চিত হন যিনি, তিনি কবিই। জীবন-জটিলতার পৃথিবীতে কবি তাই ঋষির প্রজ্ঞা-স্বরূপ আর প্রাণমন্ত্রের উদ্গাতা।

করুণানিধান তেমনি একজন কবি। বর্তমানে জন্মশতবর্ষের স্মারণিক আলোকে তাঁর বিষয়ে নতুন করে আলোচনার সুযোগ এলো। তাঁকে প্রণাম নিবেদনের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ এলো।

করুণানিধান 'অক্ষর-সঙ্গীত' প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলছেন—'কবি পঞ্চেন্দ্রিয় সাহায্যে গ্রাহ্য—রূপ, রস প্রভৃতি পঞ্চবিধ ভোগ্যগুলি ও মানসিক আবেগ-আবেশ বর্ণনা করিয়া পাঠকের হৃদয় অধিকার করেন।' কারণ, 'ভাষাই ভাবের বাহন। অক্ষরের দ্বারাই শব্দগুলি নির্মিত হয়।' করুণানিধান এখানে বলেছেন—'কবিরা বাগ্‌-যোগবিৎ। দুইটি 'আইবুড়ো' শব্দের বিবাহ দিতে হইবে, যাহারা ইতিপূর্বে পাশাপাশি বসে নাই। মাইকেল লিখিয়াছেন, 'শবদে শবদে বিয়া দেয় সেইজন···।' রবীন্দ্রনাথ 'প্রভাত-তপন' লিখিয়া প্রভাতের সহিত তপনের বিবাহ দিয়াছেন। ইহার পূর্বে কোন কবি এরূপ বিন্যাস করেন নাই। এই নূতনত্ব প্রতিভার পরিচায়ক। ইহারই নাম বাগ্‌বিভূতি।'

করুণানিধান তাঁর 'কাব্য' আলোচনায় আরো স্পষ্ট করে বললেন—'ভাবের পসরা সুচারুরূপে সাজাইতে পারিলেই পাঠকের মনোহরণ করিতে পারে।' কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—'ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষার সঙ্কেতে নিজের অনুভূত সৌন্দর্য অপরের বোধগম্য করাইতে পারিলেই আনন্দ জন্মে।' করুণানিধান 'অক্ষর সঙ্গীত' আলোচনায় বলেছিলেন—'কবিতা একটি চিত্রশালা। রসেরও ইহা রস-শালা।' এমনি ভাবে তিনি 'কাব্য' আলোচনায় আবার বললেন—'রসবর্জিত ভাব নাই, ভাববর্জিত রসও নাই। কবিতা ভাবের

বাঙ্ময়ী মূর্তি মাত্র। শব্দের বাচ্য অর্থটির আন্তরিক একটি ব্যঞ্জনা অর্থাৎ ইঙ্গিতার্থ যেন পাঠকের মনে বিশ্বামিত্রের মত দ্বিতীয় বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারে।'

কবি করুণানিধান চাইলেন কবির মানস রাজ্যে সৃজন করা জগৎ—'দ্বিতীয় বিশ্ব'। যেখানে 'ভাবের ইঙ্গিতেই স্ফূর্ত হয় কাব্যত্ব।' কারণস্বরূপ করুণানিধান বললেন—'কাব্য ভাবের প্রতিধ্বনি মূর্তি।···কাব্য পুষ্প নহে, তাহার সুগন্ধটুকু; কাব্য আকাশ নহে, তাহার আলোটুকু; কাব্য সাগর নহে, তাহার রুদ্র গর্জন।'

কাব্যভাবনার এই বিশেষ দিকটির আলোকে কবি করুণানিধানকে আমাদের অনুভব করতে হবে। তিনি বাংলার একটি বিশেষ কালে জন্মগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য কাব্যধারা আর রবীন্দ্র-কবিমনীষার যুগল সম্মিলনের উর্বর-মৃত্তিকায় যে কবিকুল বাংলা কাব্যের লীলামালঞ্চে বিচিত্র-কাকলিকুজন তুলেছিলেন কবি করুণানিধান তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কবি। তাঁর মাতুল পণ্ডিত রামনাথ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ভ্রাম্যমান পুঁথিসংগ্রাহক ছিলেন। তাঁর চরিত্র মাধুর্য ও পাণ্ডিত্য কবি করুণানিধানকে আশৈশব বিদ্যানুরাগী করেছিল। অনেকে মনে করেন পরবর্তী জীবনে কবি যে দেশভ্রমণের মেজাজটি পেয়েছিলেন তার মধ্যেও এই মাতুলের প্রভাব অনেকখানি। নিজে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন মাতুল রামনাথের সাহচর্যে। তাই সংস্কৃত কাব্য-অলঙ্কার বিষয়ে প্রচুর পঠনপাঠনের ফলে কবিমানসে একটি রসলোক সৃজন করেছিলেন যার বনিয়াদ হয়েছিল সংস্কৃত শাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। আর পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্য পাঠের অফুরন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন কবির সতীর্থ ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী মহাশয়। তাঁর পাঠাগার ছিল কবি করুণানিধানের নিত্য-পাঠের কেন্দ্রস্থল। তাই দেখা যাচ্ছে একদিকে কবির সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠের বনিয়াদ অন্যদিকে ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যপাঠের ভিত্তি রচনা—এই উভয়ের ওপর আবার বাংলাসাহিত্যের রবীন্দ্র-সান্নিধ্য। কবির মানসভূমি রচনায় এই ত্রিবেণী সঙ্গমের আস্বাদ পাই আমরা।

> 'উদয়-সুন্দরী উষা অয়ি অকুণ্ঠিতা
> পুণ্য শুভ্রা সুকুমারি, মহিম-মণ্ডিতা,
> কি দেখিছ দাঁড়'ইয়া পূর্বের পর্বতে
> উন্মীলি' নলিন নেত্র? অমৃতের স্রোতে···
> এসো উষা, এসো প্রমা, এসো ধ্রুবালোক;
> পৃথিবীর পরমাণু প্রকম্পিত হোক।' [উষা]

'উষা' বন্দনায় করুণানিধান নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু দৃষ্টিতে সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে এবং নগণ্যের মধ্যে অগ্রগণ্যকে আবিষ্কার করাই করুণানিধানের অন্যতম কাব্যমহিমা। মোহিতলাল যাকে বলছেন—

'রূপ-সুন্দরের মোহই তাঁহাকে চির-সুন্দরের দুয়ারে হাহাকার করাইয়াছে।' কারণ একটি উত্তরণের সুর কবির অন্তরের অন্তরতম স্থলে সদাই অনুরণিত হয়েছে। সেখানে কবি তাঁর একটি শাশ্বতীর চিন্তাকে সৌন্দর্যরসের জারকরসেও ভুলতে চান নি। জীবনের একটা বিরহী মানসিকতা কবির প্রায় কাব্যভাবনাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি সন্ধ্যার অনালোকিত দিনকে নিয়ে চিন্তার স্বপ্নজালই বুনেছেন সমধিক। তাঁর প্রভাতী আলোকবন্দনা খুবই কম। কবিতার এই বিশেষ দিকটির কথা যখন মনে আসে তখন তো আমাদের তাঁর জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। কবিতার নামগুলো দেখুন—স্বপ্নলোকে, স্বপ্নময়ী, দিনান্ত মেঘে, সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি, মর্মর স্বপ্ন, তন্দ্রাপথে, দোল-স্বপ্ন, শেষ বেলায়, শেষ বাসরে, হারা, ঝরাফুল, সাঁঝের সুরে, ব্যর্থ, শেষ, প্রবাসী, অদর্শনে, শেষলিপি, মরীচিকা, ক্ষ্যাপার গান, পাগলিনী প্রভৃতি।

'শেষবেলায়' কবিতাটিতে কবির বক্তব্যটি দেখুন—

> 'নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখি নয়ন মেলিয়ে
> লুকানো কোন্ ঝর্‌না ছুটে পাথর ঠেলিয়ে।
> ডাকে সিঁদুর মেঘের মায়া, সাথী-হারা তরুর ছায়া,
> শিউরে উঠি আপনাকে মোর হারিয়ে ফেলিয়ে।'

'হারা' কবিতায় বললেন—

> 'চন্দ্রকিরণ লুকায় তখন গাছের পাতার ফাঁকে,
> ফাগুন মাসের উতল বাতাস আথিবিথি খোঁজে তাকে।'

কিন্তু আসলে কবি গার্হস্থ্য প্রেমের ছবি আঁকেন, এবং জীবন ভাবনায় মগ্ন। যদিও করুণানিধান প্রেম ও প্রকৃতির পরমপূজারী। তিনি সৌন্দর্যরসিক অথচ জীবনরসিক কবি। তাঁর জীবনচর্যার সারল্যকে ছাপিয়ে কাব্যচর্চায় উত্তরণ হয়েছে ছন্দ-শব্দের ঐশ্বর্যে। ছন্দের নৃত্যে তাঁর চৈতন্য আলোকিত।

> 'হাসে সুন্দর মুখ অঞ্জন চোখ জাফরান রঙ্ অঞ্চল,
> নাহি নৃত্যের শেষ, সংগীত রেশ ফুলবাণ সব চঞ্চল।
> ওই আনমন চম্পায়
> মান স্বপ্নের আবছায়
> কার যৌবনলোল
> হাস্যের দোল রূপদর্পণ ঝলমল।'

কবি 'বসন্তবিলাস' কবিতায় জীবনছন্দের চঞ্চল নৃত্য ধ্বনিত করেছেন। মোহিতলালকে এই জন্যেই বলতে হয়েছে—'কবি যেন মূর্তিমতী বাগদেবতার আরাধনায় তন্ময় হইয়া, প্রকৃতির রূপভাণ্ডার হইতে বর্ণালোক আহরণ করিয়া, অতি ধীরে সংযত হস্তে সুনিপুণ তুলিকাক্ষেপে বাগ্‌দেবতার বেদী-পট্ট অলঙ্কৃত করিতেছেন। কাব্য ও ছন্দের এই সৌন্দর্য-স্পৃহা তাঁহার কবিহৃদয়ের বিশিষ্ট

সৌন্দর্যানুভূতির পক্ষে যতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহাই তাঁহার কাব্যের রস-প্রমাণ।' মোহিতলাল 'কাব্যমঞ্জুষা'য় আবারো বলেছেন—'করুণানিধান বাংলা গীতিকাব্যে যে একটি নূতন ধরণের প্রকৃতি-প্রেম যুক্ত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা ও কবিত্বের প্রধান নিদর্শন।' আর কবিশেখর কালিদাস রায় করুণানিধানকে বললেন—'স্বপ্নদৃষ্টির একমাত্র কবি···।'

২

'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় গত তিন পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। অতি মনোহর ও সুরভি কতকগুলি গীতিকবিতা রচনা করিয়া তিনি বঙ্গ-সরস্বতীর চরণে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতাগুলির বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য ও প্রাণমাতানো সুবাস প্রত্যেক বাঙালীর মনকে আকুল করিয়া তুলে। করুণানিধানের কাব্য-সরস্বতী একেবারে সরল, প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী এবং অতি গভীর ভাবের উন্মেষকারী।' আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য প্রসঙ্গের আলোচনাগ্রন্থের ভূমিকায় আরো লিখেছেন—'বিদগ্ধ-সমাজে, গুণিজনের বৈঠকে সকলেই তাঁহার কাব্যসৌরভে মুগ্ধ হইত। তিনি সামান্য চাকরি করিতেন, কিন্তু প্রত্যেক গুণগ্রাহী ব্যক্তির অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এই মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। আমাদের সুখের বিষয়, তিনি নিজেকে অজানিতভাবে ধরা দিয়া গিয়াছেন—তাহার ছোটখাট পত্রের মাধ্যমে এবং মিত্র ও বন্ধুদের মধ্যে তাঁহার অমায়িক ও প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহারের দ্বারা।' বহু কবির জীবনধর্মের ও কাব্যমর্মের হর্মরচনা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে নি। 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য' গ্রন্থের নিবেদনে ডক্টর মদনমোহন কুমার তাই বলছেন—'রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে বহু-বিস্তৃত আলোচনা, বিপুল তথ্য ও উপকরণ আমাদের নিকট বর্তমানে সহজলভ্য, কিন্তু তাঁহার স্নেহভাজন কবিদের জীবনের উপকরণ সুলভ নয়, সেগুলি যথাযথ-ভাবে রক্ষিত না হওয়ায় তাঁহার সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্তী কবিদের জীবনীর বহু উপকরণ লোকলোচনের অন্তরালে বিনষ্ট হইতেছে।' এ কথার যথার্থতা সম্বন্ধে সকল সাহিত্যপাঠকই একমত হবেন। কবিদের জীবন ও কাব্য, অনুরাগ ও অনুভূতি, মন ও মনন সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব-নির্ভর সামগ্রিক চিত্র ও চরিত্র-সমৃদ্ধ জীবনীরচনার উপকরণ প্রায়ই দুর্লভ। তারই মধ্যে যখন যেটুকু পাওয়া যায়, ছড়ানো ছেটানো ভাবেও যদি আসে তাতেও লাভের। সংক্ষিপ্ত হোক বা বৃহদায়তনের হোক—মোট কথা হল কবিজীবনী গ্রথিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনগ্রাহ্য।

'কবিরে পাবে না তাঁর জীবন চরিতে'—এ ধারণা মনে না গেঁথে কবির জীবন থেকে উদ্ভাসিত কাব্যপুষ্প আহরণ তো করা হবেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

কবিপুরুষের একটি অবয়ব রেখাচিত্রও পরবর্তী কাব্যপাঠকের হাতে উপঢৌকন-রূপে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনাও বাঞ্ছনীয়। কারণ কবির ছবিটি থাকবে তা হলে পাঠকের বোধের গভীরে। কবির যে মানস-পরিমণ্ডল থেকে কবিতার মৌল-উৎসার সেই উৎস-সন্ধানে কবিজীবনীর গভীরমর্মকোষে অবগাহন একান্ত প্রয়োজন। জীবন ও জগতের, রূপ ও অরূপের যে প্রকৃতিপ্রবাহে কবি তাঁর মানসিকতাকে গঠনের প্রয়াস করেছেন তারও পরিচিতি রসিকের রসগ্রহণে সহায়তা করে।

রবীন্দ্র-সমকালের জীবিত অনুজ কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্র-সমকালের অনুজদল। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাক-মুহূর্তের কাব্যকলাকার এঁরা। একদিকে রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার অন্যদিকে পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের রোমান্টিক মানসিকতা—এই নিয়ে গঠিত এঁদের একাগ্র কবিমানস। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির সৌন্দর্যবোধ করুণানিধান প্রমুখ কবিদের জীবনভাবনায় ও কাব্য-সুষমায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এঁদের মৌল কাব্যাদর্শ নিবদ্ধ ছিল রবীন্দ্র-বৃন্তেই সম্পৃক্ত। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র আরতি' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় লিখেছেন—

> 'মনে পড়ে একদিন পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার
> শুনেছি তন্ময় হয়ে তব দৈবী বীণার ঝঙ্কার।
> সুন্দরের মন্ত্র দিলে তরুণের স্মৃতি-রন্ধ্রপথে,
> ধ্বনিল উদাত্ত গ্রামে মরমের পরতে-পরতে,
> দিয়াছিলে পরসাদ, পেয়েছিনু চরণের ধূলি
> আজও সেই গর্ব জাগে, ভুলি নাই স্নেহস্পর্শগুলি।'

রবীন্দ্রানুরাগী কবি করুণানিধান সুন্দরের পূজারী ও প্রকৃতির পূজারী তথা রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শময় ইন্দ্রিয়গত জগতের কবি। তাঁর নিকট সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন কি গভীর মমতায় তাঁর মনপ্রাণ ভরা ছিল, কি গভীর বাৎসল্যে অনুজদের প্রতি অনুরাগ বর্ষিত হত। কবির এই ব্যক্তি হৃদয়ের ছবি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহসান্নিধ্য যাঁরা সেদিন পেয়েছেন তাঁরাই জেনেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রসঙ্গের বহুল প্রচারিত উক্তির পুনরুল্লেখ করছি —'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা কবির কীর্তি, তাহা ত আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝি। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই

বুঝিতে হইবে।' এবং কবিজীবনীর মধ্যে একটি অখণ্ড জীবন-এষণাকে ধরা যায়, প্রবল প্রেরণার উৎসমূলকে ধরা যায়, একটি মনই যে কত রূপে কত রঙে বর্ণাঢ্য হতে পারে তাও জানা যায়। 'ধ্রুবব্রত' কবিতায় করুণানিধান সুন্দরভাবে বলেছেন—

'আনন্দে দেখিব চেয়ে যাহা কিছু আছে
নিখিল নিলয়ে। ওগো, নাহি মোর কাছে
কিছু তুচ্ছ, কিছু ঘৃণ্য, বীভৎস, কুৎসিত।
সকলে মিলিয়া হেথা সৌম্য, সঞ্জীবিত
অসীম সুন্দর এক, এই বিশ্বরূপ।
তুমি আমি অংশ তারি, সৌন্দর্যের স্তূপ।'

কবির স্বহস্তে-লেখা আত্মজীবনীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর জন্ম ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর 'সেদিন ছিল শুক্লা চতুর্দশী, রাস পূর্ণিমার আগের দিন।' অধুনালুপ্ত 'প্রত্যহ' দৈনিক পত্রিকায় মুদ্রিত কালিদাস রায়ের প্রবন্ধে বলা হয়েছে তিনি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুরেই ছিল তাঁর পিতৃনিবাস ও মাতুলনিবাস। কবির জীবনসংগ্রামের কঠিন দিকটির বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি লিখেছেন—'তরুণ কবিকে দুইবেলা প্রাইভেট টিউশানি করিয়া সংসার চালাইতে হইত। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি তাঁহার এই দৈন্যকুণ্ঠিত শিক্ষকজীবনেই রচিত। কবি নিজের দৈন্যের জন্য একটুও কুণ্ঠিত ছিলেন না —কখনও দৈন্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন না।…ফলে আমাদের মতো দরিদ্র সাহিত্যিকদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তবে তাঁহার রচনার প্রতি অনুরাগবশতঃ অনেকেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রার্থনা করিত।…বৎসরে দুইটি দীর্ঘ অবকাশ পাইলেই কবি কলিকাতা ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে পলাইতেন, ঠিক তাঁহার কবিতার সুযোগ পাইলেই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্নলোকে প্রয়াণের মতো। ভারতবর্ষের নানা স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহাকে অবিরত আকর্ষণ করিত। স্বাস্থ্যের জন্য নয়, স্বস্তির জন্য নয়, স্ফূর্তির জন্য নয়, বিদেশের উপভোগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগের জন্য নয়, আকণ্ঠ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধুর্য পানের জন্য কবি নিজের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া একটা সুটকেস, একখানা কম্বল ও একটা বালিশ লইয়া বৎসর বৎসর বাংলার বাহিরে ছুটিতেন, কবির বহু কবিতায় ভারতের নানা স্থানের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য স্বপ্নময় বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।'

কবিশেখর কালিদাস রায়ের এই রচনার মধ্যে দেখছি করুণানিধানের কবি মানসের যথার্থ সৌন্দর্যপিয়াসী মনের ছবিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই হিসেবে ঠিকই ধরা যায় কবিকে ভ্রমণবিলাসী হতে হয়েছিল যৌবনেই।

করুণানিধান তাঁর 'রেবা' কবিতায় তাই লিখলেন—

'ফাল্গুন-রজনী মুখে গুঞ্জরে তোমার বুকে অমরী-মঞ্জীর,
মানস-রঞ্জন হাস্য ভাসে গো কমল-আস্যে নিসর্গ-লক্ষ্মীর।'

নিসর্গ শোভা দর্শনে তন্ময়চিত্ত করুণানিধান প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলাভূমিতে চাইতেন আপন বসতি। রবিকরোজ্জ্বল পর্বতমালা, উর্মিমুখর সমুদ্র বা গ্রামের পুকুর ঘাট—সে যাই হোক সুন্দর ছবি কবির মানসে অনুভূতি-উদ্রেককারী নিরন্তর প্রেরণারই উৎসস্থল।

করুণানিধান তাঁর চাকুরিজীবনের প্রথম কর্মস্থল সুজা নগরে 'পদ্মাতটে' কবিতাটি রচনা করেন, যার মধ্যে কবির প্রকৃতিসৌন্দর্য-প্রেমিক কবিদৃষ্টির পরিচয় প্রকাশিত। তিনি লিখেছেন—

'সোনালি সবুজ গাঙ, ভরা জল, এ-কূল ও-কূল করে ঝলমল ;
মেঘ-রথে করে আনাগোনা দুলায়ে উড়ায়ে তসর ওড়না—
ভাঁজে ভাঁজে ছায়া জড়ায়ে।'

কবির অকপট স্বীকৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধমনের 'প্রার্থনা' কবিতায়—

'আমারে ভুলায়
শ্যামল শাখায় ঢাকা সহস্র কুলায়
ওইখানে মোর ঘর, মানি নে আপন পর,
ফিরি হোথা গোধূলির বিদায়-ধূলায়।'

করুণানিধানের কাব্যসৃষ্টির মৌল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় ভাষাসৌষ্ঠবের প্রশংসা অনেকেই করেছেন। মোহিতলাল বলেছেন—'তাঁহার কাব্য-পাঠকালে মনে হয়, শব্দের অক্ষরগুলি পর্যন্ত বর্ণে ও গন্ধে তাঁহাকে মুগ্ধ করে।' তিনি এই সূত্রে আরো বলছেন—'তাঁহার কাব্যে প্রধানতঃ কোথাও প্রকৃতির রূপরাশি—শব্দচিত্রে, কোথাও বা সেই রূপসম্ভোগের আনন্দ—ছন্দলীলায় উৎসারিত হইয়াছে।' প্রকৃতির প্রেমে ও সৌন্দর্যধ্যানে তন্ময়চিত্ত রূপসম্ভোগের কবি তাই অনবদ্য চিত্র রচনা করেছেন বাংলা কাব্যে।

কবির আবাল্য বন্ধু সতীর্থ 'ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচীর পরলোক গমনে' নামক একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন ডক্টর মদনমোহন কুমার তাঁর 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য' গ্রন্থে। সেখানে কবি স্বয়ং লিখছেন—'য়ুরোপ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে য়ুরোপীয় কাব্যের সম্যক রসবোধ করা সম্ভব নহে জানিয়া তিনি প্রায় প্রত্যহই আমাকে লইয়া য়ুরোপীয় জীবন ও নিসর্গ সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করিতেন ও কাব্যচর্চা করিতেন। নিজে ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ক্রয় করিয়া আমাকে মাঝে মাঝে উপহার দিতেন। তিনি হিমালয় দর্শনে যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং দার্জিলিঙে নিজের বাসায় রাখিয়া প্রত্যহ নানা বর্ণোজ্জ্বল মূর্তি বায়নাকুলার সাহায্যে

আমায় দেখাইতেন আর বলিতেন যে এই বিচিত্র সৌন্দর্যলীলা প্রত্যেক কাব্য-লেখকের দেখা উচিত। তিনি আমাকে পুরীতেও পাঠাইয়া দেন সমুদ্রের নীলিমা দেখিবার জন্য। বলিতেন, অনন্তের সহিত যুক্ত হইবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমুদ্রের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।'

এই প্রসঙ্গে কবির 'শতনরী' গ্রন্থের দুটি কবিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং 'ওয়ালটেয়ার' কবিতা দুটির কথা বলা হচ্ছে। কবি সমুদ্র শোভায় বিমুগ্ধ মানসে 'ওয়ালটেয়ারে' কবিতায় লিখেছেন সেখানের নিখুঁত কথাচিত্র—

'সামনে হেরী সুনীল বারি তালীবনের ফাঁকে,
গেরুয়া-রঙ্ ভাঙা মাটি ঢালু পথের বাঁকে;
ঝর্ণা-ঝালর পড়ছে ঝরি শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে কালো পাথরে ঢাকে।'

তেমনি আবার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র বর্ণনা কবির কলমে—

'শ্বেত বিজুলী নিথর হয়ে ঘুমিয়েছে ওই মূর্তি লয়ে—
শিথানে তার উজল ঢেউএর সার;
ছাড়িয়ে ঐ ঊষার তারা সামনে নেমে আসছে কারা?
কটাক্ষেতে স্ফটিক হল বারি॥'

উপমার সহজ প্রয়োগে কবি করুণানিধান কবিতার ভাবসংহতি এমন একটা উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়ে দেন যেখানে অতি সাধারণ কথাচিত্রও কাব্যমূল্য লাভ করে। এই সাধারণকে অসাধারণ-প্রায় কাব্যমর্যাদাদানই কবির যথার্থ কাব্যিক বৈশিষ্ট্য।

কবির চটুল ব্যঙ্গের ছোঁয়াও পাওয়া যায় অনেক কবিতায়। তাঁর তাই তো 'বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত' কবিতাটি বেশ জনপ্রিয় হয়। কবি বলছেন—

'অথ বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় আষাঢ়স্য পয়লা
ভরিল গগন নবীন নীরবে বরণ জিনিয়া কয়লা।'

বাস্তব চিত্রেরই কৌতুক কর প্রকাশ।

করুণানিধান যে কত রসিক কবি, কত মধুভরা মর্জির কবি তা তাঁর 'বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত' কবিতাতেই বোঝা যায়। সেখানে বলছেন—

'বড় সুখে ভাই ছিনু অলকায়,
সে এক স্বপ্ন-রাজ্য
রোজ রোজ ভাই ভোজের ফর্দ
চর্ব্য. চুষ্য. লেহ্য.
জাফরাণ-রাঙা মটন কোর্মা,
চপ-কাটলেট-পোলাও,

তস্য উপরি ল্যাঙড়া আম্র
এবং রাবড়ি ঢালাও।
মিটাতাম তৃষা চাখিয়া চাখিয়া
আনারকা মিঠা শর্বৎ ;
গড়গড়া থেকে উড়িয়ে দিতাম
ধোঁয়ার বিন্ধ্য পর্বত।'

'হিমাদ্রি' কবিতায় ('শান্তিজল' গ্রন্থে প্রকাশিত) বলছেন—

'কোটি বন-ফুল অঙ্গে দোদুল, কত রঙ্ শোভা আলো ;
দ্বিপ্রহরের ঝিল্লীর তান শুনিছে পাষাণ কালো।'

কিন্তু 'ধানদূর্বা' গ্রন্থের 'বাঙলা দেশের মেয়ে' কবিতায় উচ্চারিত হল—

'ননীর চেয়ে-কোমল-হিয়া বাঙলা দেশের মেয়ে,
স্বর্গ-পুরীর স্বর্গ হেরি তোমার পানে চেয়ে।'

করুণানিধান 'দক্ষিণেশ্বরে' কবিতায় বললেন—

'বহি-শিব হৃদে কালী' গদাধর যোগী
দেখায় পাষাণী মাকে ছিয়া 'দগদগি'।'

শুধু স্বপ্নেরই আবছায়ে জীবনকে কি তিনি দেখেছেন? মনে হয় তিনি স্বপ্নাতীত মহিমায় জীবনের উজ্জ্বলতাকেও তো দেখেছেন। তাই যৌবনের জয়গান এবং শাশ্বতীর সিদ্ধিও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টিতে প্রতিভাত ছিল। তাই উচ্চকণ্ঠেই 'চিত্রকূটে' কবিতায় বললেন—

"জয় সীতারাম'—
বনের চন্দনা টিয়া গায় অবিরাম।'

তাই 'শ্রীক্ষেত্রে' কবিতায়ও গভীর ভঙ্গিতে বলছেন—

'হে মহার্ণব, নীল-ভৈরব গর্জন-জলভঙ্গে,
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান
তুলিতেছে কার বন্দনা-গান ?
নরুন্দিব উদ্বোধনের দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।'

কবির মানস-ইচ্ছা কিন্তু একটি ধ্রুবে স্থির। তিনি মানব কল্যাণকামী। জীবনস্বামীকে পেতে চেয়েও জগৎ হিতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাখেন। তাঁর 'প্রসাদী' গ্রন্থের 'ধ্রুবব্রত' কবিতায় বললেন—

'আমারে অর্পিনু আমি মানবের তরে
মানবের শুভব্রতে। ধরণীর ঘরে
যাহারা অতিথি আজ,...'

যদিও কবির 'ঝরাফুল' কাব্যের উপলব্ধি গভীর আর্তির সুরে প্রকম্পিত। বলছেন—

'আজি দিব দেব, জীবনাঞ্জলি ঢালিয়া,
চিত্ত-দেউল 'পঞ্চ-প্রদীপ' জ্বালিয়া,...'

কারণ কবি যে জানলেন—

'ঐ শোনো গায় আহা,—'সত্য যাহা পুণ্য তাহা',—পূর্ণ কলস্বর
উঠিছে উপর-পানে, পশে কানে প্রাণে প্রাণে প্রেমই ঈশ্বর।'

'প্রবাসী' কবিতাটির এই শেষ দুছত্রে গভীরতম সত্যের বাণী উচ্চারণ করলেন। জীবন বাণীও তাঁর। 'প্রেমই ঈশ্বর'।

তাই বলতে পেরেছিলেন—

'বনের পাখিরে ধরে যতনে আদর করে রাখিলে খাচায়,
ডাকে বটে বারে বার, প্রাণহীণ সে ঝঙ্কার বাজে বেসুরায়।'

কবির একেবারে সহজিয়া সুরে সরল অভিব্যক্তি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল' থেকে তিনি একেবারে অন্যসুরে কথা বলছেন—কারণ সেখানে ছিল মৌলভাবে স্বদেশ ভাবনা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যন্ত্রণাকাতর বাঙালি মানসিকতা। তাই বলেছিলেন—

'হাজার আঘাত করুণ রাজা তফাৎ রাখিতে,
ভাই কি কভু ভাইকে ছেড়ে পার্বে থাকিতে?'

রবীন্দ্রনাথের 'রাখীবন্ধন'এর সময়ের সুরটি তখন করুণানিধান কণ্ঠে নিয়েছেন। এই সময় করুণানিধান সম্পূর্ণভাবে এবং সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তখন তাঁর 'বঙ্গমঙ্গল' ও 'প্রসাদী' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশীয় ভাবনার কবি রূপে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের ছাত্ররা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই তাঁর প্রথম সম্বর্ধনা। পরিণত বয়সে তিনি বহু সম্বর্ধনা লাভ করেন। কিন্তু সেই দিনের তরুণ কবির স্বদেশী ভাবনার জন্য সম্বর্ধনা লাভ অভাবনীয়। কলেজের অধ্যক্ষই ছিলেন সেই সম্বর্ধনা সভার সভাপতি। করুণানিধান 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' বা সাহিত্যিক অনুজদের দ্বারা কলেজ স্কোয়ারের ধারে 'মহাবোধি সোসাইটি'র সভাগৃহে সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। উনসত্তরতম জন্মদিনের উপলক্ষে সেই সম্বর্ধনা হয়েছিল। তাঁর শান্তিপুরের বাসভবনে ফলক স্থাপিত হয়েছিল—সবই সত্যি কিন্তু জীবনের প্রথম প্রভাতী লগ্নের সম্বর্ধনাটির তুলনা হয় না। তবে সেই স্বদেশী সংগীত রচনার প্রয়াসে কবি করুণানিধানকে বেশি দিন আচ্ছন্ন করে রাখে নি। কিংবা তার প্রকাশ পাঠকের চোখের সামনে আর পৌঁছায় নি। কবির যাঁরা নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা বলেন যে, তিনি খুবই লিখতেন। কিন্তু সেই অনুপাতে সেগুলির প্রকাশ তেমন হয় নি। মনে হয় তাঁর নিজের মনের মতো যতক্ষণ লেখা না হয় ততক্ষণ প্রকাশ করতে কুণ্ঠা ছিল। তার ফলে হয় তো অনেক ভালো কবিতা

থেকে আজকের পাঠককূল বঞ্চিত হয়েই রইলেন। তাঁর যে কাব্যসত্তার আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছে তাই দেখে ভাবতেই হবে তিনি আরো বড় কবি ছিলেন। তাঁর উন্নত কবিপ্রাণ ছিল, এবং উন্নত ছিল কাব্যাদর্শও।

কবি করুণানিধানের সহজ আর্তি সরল ভাবানুভূতিতে এক ললিতমধুর ছন্দসুষমার শব্দচিত্রে রূপান্তরিত হয়। সেখানে কবির মগ্নচৈতন্য পাঠকের চেতনালোকে অনুরণন তোলে ভাবে ও ভাষায় সুকুমার অবয়ব ধারণে। কবির এই গুণটি কোনো দুরূহ বাণী বা 'মিষ্টিক' সুর ধ্বনিত তেমন না করলেও একজন কবির ছন্দিত লীলাকে উপল ব্ধর উপান্তে অন্তত আমাদের উপস্থাপিত করে।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের ঘটনা ও মানসরচনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমাদের সব থেকে বেশি করে যে যে দিকের কথা মনে আসে তা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণই। প্রথম যৌবনে তাঁর বিয়ের ঘটনাটার কথা ধরা যাক—তিনি বন্ধুর সঙ্গে খড়দহে কুলীন পাড়ায় গোপনে ভাবী গৃহিনীকে দেখতে ছুটলেন। কার কন্যা তা জানেন না ফলে হতাশ হয়ে সেখানে পুকুরঘাটের কাছে গাছ তলায় দুই বন্ধুতে বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় দেখলেন যা, তারই স্মৃতিচিত্র কবি অনেক কবিতায় এঁকেছেন। দেখলেন পুকুরঘাট থেকে এক বৃদ্ধা উঠলেন আর তারই পিছু পিছু উঠলেন এক কিশোরী রূপসী। চোখাচোখী হতেই লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয় সুন্দরী মেয়ে। কবিকে বিবাহের দিন চিনতে পারলেন রূপসী এবং কবিও চিনলেন প্রিয়াকে। তাঁর 'সে', 'মৃণু', 'দ্বিপ্রহরে', 'দুমকারাণী', 'হায়', 'বনের কোণে', 'উদ্দেশে', 'মনোহারিকা' প্রভৃতি কবিতায় এই চিত্রেরই ছায়াপাত হয়েছে। 'বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত' কবিতায় স্পষ্ট এই ছবি—

> 'কোনো মেয়েটির হাসি মুখখানি খাটটি করেছে আলো
> পৃষ্ঠে এলানো এক-ঢাল চুল ভোমরার চেয়ে কালো।'

কবি প্রেমজীবনের উৎসমুখ উৎসারিত করেছেন আপন ভাবীবধূর লজ্জা নম্র বালিকা কোমলতার সুন্দরী চিত্রের চৈতন্যেই। প্রশ্নের ছলে কবিবন্ধু সতীশচন্দ্র বাগচী তাই 'বন্ধুস্মরণে' কবিতায় উল্লেখ করেছেন—'সত্যিই কি ছিলেন তিনি রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে'।

কবির বাল্যজীবনের আর একটি ঘটনা সে যুগের বাঙালী ঘরের সার্থক চিত্র হয়ে ফুটেছে। কবি বলেছেন যে তাঁর বাল্য কবিতার প্রথম শ্রোতা ছিল তাঁরই সেজকাকার মেয়ে মানুবালা। কারণ পরিবারের অপরজনরা এই কবিতা লেখাকে খুব সুনজরে দেখতেন না। কবির মৃত্যুর কিছু দিন আগে

'ভোলা কথা' নামে আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি থেকে ডক্টর মদনমোহন কুমার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে অংশ, তাতে প্রমাণ হয় যে কবি প্রথম কবিতা লেখেন পঞ্চকোটে। এবং এই কবিতাটিতে সেখানের একটি নিখুঁত প্রাকৃতিক চিত্র অংকিত। শান্তিপুরে বাগানের গাছতলায় বসে কবি বাল্যে কবিতা লিখতেন। মাতৃবালা সেখানে চুপি চুপি গিয়ে কবি-দাদার নতুন লেখা কবিতা শুনে আসতেন।

কবিজীবনের শেষ অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে তিনি চঞ্চল। স্থিরভাবে কোথাও থাকছেন না। একবার বান্ধবগৃহে একবার আত্মীয়গৃহে একবার পৈতৃক বাসভবনে—কোনোখানেই যেন স্থিতি খুঁজে পাচ্ছেন না। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই বিষয়ে বলেছিলেন—'করুণাদাদা বৌদিকে হারিয়ে স্থির থাকতে পারেন নি, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।' হয়তো তাও হতে পারে। কারণ কবির পত্নীপ্রেম গভীর হৃদয়ের। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' বা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের কবিমানসের সন্ধান হয় তো এখানে কার্যকরী হয়েছে। প্রেমিক কবিমন আসঙ্গ জীবনসঙ্গিনীর বিরহে অস্থিরতায় দিন যাপন করেছেন। একটা স্থিতিশীল অবস্থাকে ভুলে চাঞ্চল্যের মনে সুদূরের পিয়াসী হয়ে চলেছেন। তাই 'উত্তরণ' কবিতায় বলছেন—

'জীবন-মৃত্যু-সঙ্গমে একা বাই তরণী ; সাগর হইয়া গিয়াছে সুমুখে বৈতরণী।
কতটুকু তার চোখে পড়ে হায়, ঢাকে আসমানি নীল পর্দায়
ওই কিনারায় শেষ হয়েছে কি এই ধরণী ?'

কবিজীবনের এই একান্ত বিরহী মানসিকতা এবং তার ফলে উৎপন্ন যে আর্তি তাই তো তাঁর কাব্য-ভাবরাজ্যে অনেকটাই প্রভাববিস্তার করেছে। ব্যক্তিজীবনের যে দুঃখ বেদনা যে মানসনিঃসঙ্গতা তাই তো তাঁর কাব্য-আত্মায় সঞ্চারিত। এবং এই সঞ্চারিত ভাববিভূতি পাঠক মনে অনুরণিত হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে সমষ্টিজীবনের অনুভূতিতে। কবির ভাষা ও ভাবছন্দের মাধুর্যে এটাই গভীর তাৎপর্য পূর্ণ।

তাঁর অনেক ধরণের কবিতা আছে। কিছু কিছু কবিতা যেমন ব্যক্তিপূজার ছলে রচনা—এগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখেই কবি করুণানিধানকে বাংলা-কাব্যধারায় বরণীয়। তাঁর যুগধর্মী স্বদেশভাবনা বা মনীষীপূজার কবিতা এহবাহ্য, প্রকৃতিপ্রেমিক ছন্দসুষমার কবি করুণানিধানই স্মরণীয়। 'শতনরী'তে গ্রথিত 'রাজা রামমোহন' কবিতায় 'জয় রাজা রামমোহন, হে বরেণ্য ব্রাহ্মণ প্রবর' বললেন এবং 'রামমোহন সপ্তক' কবিতায় কবি লিখলেন—

'নমো নমো হে ব্রাহ্মণ, হে রামমোহন,
ধন্যতপা মহামায়া ; তোমার সাধন—'।

বিবেকানন্দের আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কলকাতার নাগরিকবৃন্দ

শোভাবাজার রাজবাড়িতে যে সম্বর্ধনা সভা করেন সেখানে উনিশ বছরের বালক কবি করুণানিধান স্বরচিত কবিতায় বলেন—'এস এস এস বিবেকানন্দ ভারতের ধ্রুব পূর্ণ চন্দ।' তেমনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'জয়হিন্দ' স্মরণে লিখলেন—'নগেশ-শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত জয় গৌরবিত হিন্দুস্থান'। কবি মহৎপ্রাণের বন্দনায় সদা নিরত ছিলেন। সাময়িক প্রয়োজনেই হবে-বা তিনি বহুভাবে স্তুতি-মূলক কবিতা রচনা করেছেন। 'জেগেছে আজ দেশের ছেলে' বলে 'মোহন-বাগান' ফুটবলখেলার বিজয়ীদলের ওপরও লিখেছেন যেমন তেমনি শরৎচন্দ্রের ওপরও লিখলেন—রবি-চন্দ্রে যুগপৎ উদ্ভাসিত বঙ্গের আকাশ' বা 'শরৎ-বন্দনা' কবিতায় লিখেছেন—'জয় জয় শরৎচন্দ্র, মোহিয়াছ বাঙালীর প্রাণ'। এই পর্যায়ের সব থেকে মর্মস্পর্শী রচনা 'সত্যেন্দ্র স্মরণে'। সেখানে বলছেন—'দুপুরে বাজিল একি আলোশেষ পূরবী'। কবিবন্ধুর অকাল প্রয়াণ, একেবারে গভীর শোকাহত অন্তরের আর্তনাদ।

স্বদেশী আন্দোলন কালে কবিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সাহচর্যে আসতে দেখা গেল। আবার কর্মজীবনে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহচর্যে এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। এই রকম সমসাময়িক কালের মনীষী মহৎ সান্নিধ্যে ছিল কবির জীবন ভরানো।

কবি করুণানিধানের কবিতায় প্রাকৃতিক বর্ণনা যেমন একটা প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য তেমনি তাঁর কবিতায় ছন্দবৈচিত্র্যও লক্ষ্য করার মতো। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য বা পাশ্চাত্যকাব্যের ছন্দচাতুর্যের অবলোকন—যেভাবেই হোক এটি তাঁর স্বভাবধর্মে সংযুক্ত ছিল। মিলের দিকেও তাঁর চাতুর্য স্বীকার্য। এই দুই বিষয়ে বিপুল উদাহরণের সংযোগে আলোচনার অবকাশ আছে।

কবির আর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক কাব্যপাঠকেরই নজরে পড়বে, সেটি হল—করুণানিধানের অনেক কবিতাতেই খণ্ড খণ্ড শোভন কথার রেখাচিত্র অংকিত হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতিচিত্র অংকনের ফলেই এটি বেশি করে পাঠকের চোখে ধরা থাকে। পাঠক মুগ্ধ হয় ছবিতে ও ছন্দতেও। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর অনুজভক্তদের অন্যতম। তিনি 'কবি করুণানিধানের কবিতা' প্রবন্ধে বলেছেন—'যে প্রকৃতিপ্রেয়সী তাঁহাকে রূপের কুহকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর এক মূর্তি যেন ইন্দ্রিয়-জগতের ওপার হইতে আর এক ভঙ্গিতে তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। এই আলোছায়ার পারে, জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত-দেশে অকূল-অচিহ্নিতের মোহানায় তাঁহার প্রাণ যেন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, রূপসৌন্দর্যের সুস্পষ্ট অনুভূতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়—'পথের জ্যোছনা ভুলায় আমারে, কাঁপে প্রাণ-পারাবাত'।'

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘজীবী ছিলেন কিন্তু সেই তুলনায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ মাত্র চৌদ্দটি গ্রথিত হয়। এর মধ্যে একটি নতুন সংস্করণ এবং শেষের দুটি তো পাণ্ডুলিপি আকারেই থেকে গিয়েছে।

এর কারণ যতটা মনে হয় অর্থনৈতিক তার থেকেও মনে হয় বেশি পরিমাণে গৃহিণীপনারই অভাব ছিল হয় তো-বা কবিজীবনে। না হলে কিভাবে সে যুগের অজস্র পৃষ্ঠপোষকতায় বহু কবিরই গ্রন্থপ্রকাশ হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কালিদাস রায় যা বলেছেন সেটাও যে একটা কারণ না হতে পারে তাও নয়। তিনি কবির বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি সেকালের অবস্থাপন্ন বিলাসীদের সঙ্গে মিশতেন না। ফলে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের অভাব থেকেই গিয়েছিল। যে উদার দাক্ষিণ্যে তাঁর কাব্যকীর্তি অফুরন্ত প্রকাশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেতো তা যথোপযুক্তভাবে যে পায় নি তা আজ অকপটে স্বীকার্য।

কবির পিতৃদত্ত নামেও যেমন নিবেদনের আর্তি তেমনি কবি স্বয়ং তাঁর কাব্যগ্রন্থেরও নামকরণে রেখেছেন একটা আত্মনিবেদিত এষণা। ১৯০১ সালে 'বঙ্গমঙ্গল', ১৯০৪ সালে 'প্রসাদী', ১৯১১ সালে 'ঝরাফুল', ১৯১৩ সালে 'শান্তিজল', ১৯২১ সালে 'ধানদূর্বা', ১৯৩০ সালে হেমচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 'শতনরী', ১৯৩৭ সালে কালিদাস রায় সম্পাদিত 'শতনরী', ১৯৩৭ সালে 'রবীন্দ্র-আরতি', ১৯৪৯ সালে 'গীতায়ন', ১৯৫১ সালে 'গীতারঞ্জন' প্রকাশিত হয় এবং 'চিত্রায়নী' ও 'শেষপসরা' পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে অপ্রকাশিত। 'ভোলা কথা' নাম দিয়ে তিনি জীবনস্মৃতি রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন কিন্তু অসমাপ্ত-ভাবেই তা রেখেগিয়েছেন। তাঁর দশটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সে সবের মধ্যে তাঁর কাব্যচিন্তারই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

করুণানিধান কবি-স্বভাবে এবং কাব্য-প্রকাশে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। ভাবপ্রকাশের নিখুঁত চিন্তায় থাকতেন সদামগ্ন। এই প্রসঙ্গে কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখছেন—'পঞ্চপুষ্পের দপ্তরে বহু বিশিষ্ট বিদগ্ধ সাহিত্যসাধকের সমাবেশ হত।...পরমপূজনীয় কবিপ্রধান শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এ কেন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ। এই আপন-ভোলা কবি ভাবজগতেই বিচরণ করতেন, আর সংসার ধর্ম করতে হয়, তাই করতেন।...পঞ্চপুষ্পের ফর্মা মেসিনে উঠেছে, মেসিন-প্রুফ দেখে দেওয়া হচ্ছে এমন সময়ে ওর মনে পড়ে গেল একটা সুন্দর কথা। অমনি মেসিন থামিয়ে সেই কথাটি বসিয়ে ওঁর কবিতার ভেতর থেকে পূর্বের প্রয়োগ করা কথাটি তুলে নিয়ে পরিবর্তন করতেন—এ রকম রীতি ওঁর দৈনন্দিন অভ্যাসভুক্ত হয়েছিল।' সাহিত্যের আলোচনায় কোথাও যেতে গিয়ে তিনি বাড়িতে বাজার করে নিতে ভুলে যেতেন অথবা

বোহিসাবিপনা ছিল—এ সব কিছুকে বাদ দিয়েও তাঁর যে একটা নিটোল কবি-মন ক্রিয়াশীল ছিল, তা তাঁর সান্নিধ্যে এলেই বেশ বোঝা যেতো।

করুণানিধান ব্যক্তিক-জীবনে ও কাব্যিক-মননে একান্তরূপে প্রায়ই দেখা যায় একাত্ম হয়েই থেকে গিয়েছেন। স্বদেশী যুগের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেওয়া বা দেশী ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করা—এই রকম সব কিছুতেই ছিল তাঁর অন্তর প্রেরণার গভীর উৎসে-লিপ্ত মানসিকতা।

করুণানিধানের আখ্যায়িকা কবিতাগুলির সুর ও বাণী একটা স্বপ্নাবেশ রচনা করে পাঠক মনে, তাঁর বিচিত্র স্বাদের কবিতাগুলি আমাদের 'কানের ভিতর' দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে শব্দ-ছন্দের দোলায় মাতায় কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'গীতায়ন' যা আবার নতুনরূপে 'গীতারঞ্জন' আকারে আত্মপ্রকাশ করলো সেখানে ভিন্ন সুরে ভিন্ন কথার মালা গাথা। গীতার বাণীকে হৃদয়ে তখন করুণানিধান গভীর ভাবে গ্রহণ করেছেন। যেন জীবনের শেষ সম্বলরূপে।

'কর্মে তাঁরে করিলে প্রীত হবে গো তাঁর প্রিয়,
যা কিছু করো, ফলের সনে তাঁরেই সমর্পিয়ো।'

গীতার বাণীকে তাঁর 'আত্মা' প্রবন্ধেও প্রকাশ করলেন। আশ্বিন ১৩৫৭ 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত 'আত্মা' প্রবন্ধে তাই তিনি লিখেছেন—'ওঁ তৎ সৎ—ইহাই ব্রহ্মের নির্দেশ। ব্রহ্মের অমূর্ত রূপই সৎ। তিনিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্‌ রূপে বিরাজিত। তিনিই ভোক্তারূপে সকল ভোগ্যের অধিকারী হন। তিনিই চতুর্বিধ অন্ন (চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়) জঠরাগ্নিরূপে প্রাণ ও অপানের সহিত যুক্ত হইয়া পরিপাক করিয়া থাকেন। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। সেই আত্মা হইতে প্রাণীমাত্রের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলুপ্ত হয়। (গীতা ১৫/১৫), কিন্তু এ সব জীবনের বিষন্নকালের চিন্তাভাবনার ফল। তাঁর যৌবনচিন্তায় 'স্বপ্নবাসর'ই আসল কবি-আত্মা। 'বসন্ত বিলাস'ই কবিমানসের শাশ্বত ছবি।

তাই 'নিস্ফল' কবিতায় বলেছিলেন—

'হায়রে আমার সাধের ফসল ডুবিয়ে দিলে মরীচিকার জল
আজনমের সোনার স্বপন বজ্র-শিখায় করছে ঝলমল!
কোথায় ছুটি আঁধার রাতে! প্রলোভনের আলেয়াতে
মণির মতো ঝল্‌সে আঁখি সারা-জীবন করল অ-সফল।'

এ যে কবির সহজিয়া স্বীকারোক্তি, এক সরল অভিব্যঞ্জনায় ভরা। তাঁর ব্যক্তিজীবন-মানসিকতারও এখানে আঘ্রাণ পাওয়া যায়।

কবির সহজ মন ও সরল প্রাণের পরিচয় তাঁর পত্রগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। তিনি গল্পলেখক রামপদ মুখোপাধ্যায়কে ১৬।১।৫৩ সালে লেখা এক পত্রে লিখছেন —'লক্ষ্ণৌ-এর জল-হাওয়া বাঙালীর সহ্য করা কঠিন। আমিও ওখানে একবার

গিয়াছি।' এই পত্রেই তাঁর স্মরণীয় একটি উক্তি বিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য—'আমার শরীর দিন দিন অপটু। ওপারের বাঁশি শুনিতেছি। মৃত্যু-জাগৃতির জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছি। এই চৈতন্তময় জীবনধারায় সমাপ্তি নাই—তাহা বেশ বুঝিতেছি। জীবন-ভরা ঝামেলা সহিয়া ৭৫ বৎসর কাটিয়া গেল। কে জানে আরো কত দিন?' কবি ২৬ এপ্রিল ১৯৫৩ তারিখের এক পত্রে জ্যোৎস্নানাথ মল্লিককে লিখলেন—'আমার বয়স যখন ২২ বছর তখন আমি বাঁকুড়ায় গিয়াছিলাম। লাল কাঁকরের ডাঙ্গা, শাল বন। 'শুশুনিয়া' পাহাড়ের জল-প্রপাত আমাকে হাতছানি দিত; গন্ধেশ্বরী নদী ও দারুকেশ্বরের এখনো স্বপ্ন দেখিতে পাই। কোথায় সেই প্রথম যৌবন?' অকপটে আপন প্রকৃতি-প্রিয়তার মনটিকে এখানে সহজসরল ভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন।

জীবনপ্রেমিক কবি, সৌন্দর্যরসিক কবি—প্রেম ও প্রকৃতির লীলামানসে সদাই ছিলেন সচঞ্চল। নিজের স্মৃতিরোমন্থনেও তাই তাঁর অনুরাগ। এমনি এক রাগরঞ্জিত কবিজীবন ছিল করুণানিধানের। তিনি সমস্ত দুঃখের জগত-নদীর স্রোতে ভেসে উত্তীর্ণ হন অপার প্রেমের সুরভিসুন্দর প্রকৃতিতে।

শেষের দিকে কবি প্রায় আত্মগোপন করে নির্জনে থাকতেই যেন ভালো-বাসতেন। এ কথা বিশেষ করে তখনই আমাদের মনে আসে যখনই তাঁর যৌবনজীবনের কথা পাঠ করা যায়। তিনি প্রতিটি সন্ধ্যায় সাহিত্যের আসর যেখানে বসেছে উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তন্ময় হয়ে থেকেছেন কাব্যরচনায়। সংসারের দারিদ্র্য সেখানে বাধা হতে পারছে না। তিনি কবিজীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সাংসারিক-জীবন-সর্বস্ব হয়ে থাকেন নি। কবিমনই তাঁকে সাহিত্যের বৈঠকে বসতি দিয়েছে, সংসার মানসের যত বিরূপতাই থাকুক। হয় তো তাতে লক্ষ্মীর কড়ি উপচিয়ে ওঠে নি কিন্তু সরস্বতীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে অফুরন্ত।

তিনি তখন বাংলার জীবিত জ্যেষ্ঠ কবি। তাই তাঁকে যখন বাংলা ১৩৬১ সালে 'সাহিত্যতীর্থ'এর প্রথম তীর্থপতিরূপে বরণ করার সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়া হল—তাতে তিনি সানন্দে অভিভূত ও পুলকিত হয়ে স্বীকৃতি জানালেন, কিন্তু স্থিতধি হলেন না। কয়েক জায়গা ঘুরে পৈতৃকভিটে শান্তিপুরে গেলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে এই বছরেরই মাঘের বাইশে তারিখে পরলোকগমন করেন।

জন্মশতবার্ষিকীর আলোকে আজ আবার নতুন করে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনকথা ও কাব্যকথা পাঠ ও পর্যালোচনার সুযোগ এসেছে। এ তাৎক্ষণিক সুযোগ এলেও কিন্তু তা যথার্থ সুলভ নয়। কারণ

কবির যে কয়টি গ্রন্থ তাঁর জীবিত কালে প্রকাশিত হয় তা নিঃশেষিত। পাঠক একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করছেন পাঠাগারের সংরক্ষিত গ্রন্থের ওপর। তাও আবার সব পাঠাগারে কবির গ্রন্থ পাওয়াও যায় না। যেখানে পাওয়া যায় সেখানেও আবার একজন নিয়ে যান যদি, অন্যজন চাইলে তাঁর প্রাপ্তি লাভে যথেষ্ট বিলম্ব হয়। এই অবস্থায়েই কবির শতবর্ষ উদ্‌যাপন হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে আসে, তিনি লিখেছিলেন—'যখন রব না আমি' তখন ডেকো না, ডেকো না কোনো সভা। কি হবে সভা ডেকে কবির স্মরণে যদি তাঁর সৃষ্টির সৌরভ ছড়িয়ে না দেওয়া গেল। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষের জন্মদিনে দাঁড়িয়ে তাই আক্ষেপ আমাদের এই যে, তাঁর কবিতার বইগুলির এখনও সুলভে প্রকাশ হয় নি। প্রচার-বিমুখ কবি রূপে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ অনেকেই তো অনেকবার বলেন। সে কথা ঠিকই; কিন্তু তাঁর যে প্রচার সে তো অনুজদের দায়িত্বে। এখনই সে দায়িত্ব শতবর্ষের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে অনুরাগীজনের অবশ্য পালনীয়।

তাঁর কবিতা এবং কিছু ছোটো নিবন্ধও রয়েছে। সব মিলিয়ে এক-মলাটের মধ্যে রচনাবলীর সীমিত অবকাশই আছে। তাই মনে হয় এ বিষয়ে এখন একটা বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া বেশ সময়োপযোগী উদ্যম হবে এবং সার্থকতম প্রয়াসই হবে।

রবীন্দ্র পরবর্তী জীবিত-জ্যেষ্ঠ কবি রূপে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে ১৩৬১ সালের ১লা বৈশাখের সকালে আমাদের যে নামটি স্মরণের আঙিনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে নামটি—কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ঠিক হল বাংলার জীবিত-জ্যেষ্ঠ কবিকে সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতিরূপে বরণ করা হবে। কিন্তু তিনি এখন কোথায় থাকেন? শান্তিপুরে সেদিনই চিঠি লেখা হল। দেশের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে দেখা যাক উত্তর আসে কি না। কিন্তু না, কোনো উত্তর নেই। এদিকে আমরা পয়লা আষাঢ় প্রথম প্রকাশ্য সভা আহ্বান করবো ঠিক করেছি। কিন্তু প্রথম তীর্থপতির কোনো সন্ধানই আসছে না। একটা সমস্যায় পড়া গেল। কি করা যায়? এর মধ্যে আরো দুটো চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠি পেলেন, কি পেলেন না; কে জানে? থাক সে চেষ্টা, তখন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রথম প্রকাশ্য সভা বসলো শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে। কিন্তু আমরা জীবিত-জ্যেষ্ঠ কবিরূপে করুণানিধানের কথা মনেই ধরে আছি। আমাদের ধারণা বাংলার সাহিত্যিক সমাজে যিনি জীবিত-জ্যেষ্ঠ, তিনি তীর্থপতি হলে সবার মিলিত হওয়ার মন একটা অবশ্যই হবে।

প্রথমদিকের আমাদের অরুণিম-বাসনা অবশেষে একদিন উজ্জ্বল-আশায় প্রভাতী সূর্যের দীপ্তিতে আলোকিত হল। চিঠি এলো কবি করুণানিধান

বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি সানন্দে তীর্থপতি পদ গ্রহণ করবেন জানালেন এবং হাওড়ায় তাঁর অবস্থান কালের তারিখসহ জানালেন দেখা করার জন্যে।'

আমি দেয়ালপঞ্জীর পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখলুম কবি চিঠিতে যে তারিখ উল্লেখ করেছেন তাতে সেদিন ১৮/১ মধুসূদন বিশ্বাস লেন হাওড়ার ঠিকানায় থাকার মধ্যেই হচ্ছে। আমি সেইদিনই সকালে হাজির হলুম কবির পত্রে দেওয়া ঠিকানার উদ্দেশেই।

এতদিন পর কবির যা হোক ঠিকানা যখন হাতে পেয়েছি তখন আর দেরি করবো—এমন মন হল না। একটা আনন্দের আতিশয্যে মানসিক উৎসাহ তর্-সইতে দিলে না যেন।

হাওড়ার বাড়িতে গিয়ে দেখা হল। তাঁর চিঠি দেখিয়ে পরিচয় বলতেই আমায় আদর করলেন জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে। বললেন—'আরে, চিঠি পেয়ে তো আমি ভেবেছিলুম বেশ প্রবীণ হবে বুঝি তুমি। ভারী ভালো লাগলো।'

আমি পায়ে হাত দিয়ে শ্রদ্ধাপ্রণাম নিবেদন করলুম। তার পর বসে বসে তিনি অনেক কথা বললেন। তাঁর কবিতা লেখার কথা, কবিতার বই প্রকাশের কথা—এমনি নানাবিধ কথায় সময়টা ভরিয়ে দিলেন। আমার মনটা যে কি অপরিসীম তৃপ্তিতে ভরে উঠছিল তা বলার নয়। তিনি এমন একটা আনন্দময় মূর্তিতে সেদিন আমার সামনে বসে কথা বলছিলেন যে, আমি এখনো চোখ বুজলে সেই ছবি দেখতে পাই, কি সুন্দর কবির হাসি ভরা মুখ!

তিনি আশীর্বাদ করলেন। জলযোগ করে যখন উঠে আসছি, বললেন—'সাহিত্যতীর্থ, ভারী ভালো নাম ঠিক করেছ। তীর্থপতি আমি, কিন্তু কি করবো এই বয়সে? তোমারই বড় দায়িত্ব, বড় কাজ, নিশ্চয় পারবে। করো।'

কবিকে লেখা আমার ১৪ই কার্ত্তিক ১৩৬১ সালের একটি চিঠি 'করুণা-আরতি' গ্রন্থে মুদ্রিত দেখে সেদিনের তাঁর আলাপের অনেক কথাই মনে আসছে। তিনি প্রকাশকের কাছ থেকে কি সামান্য দক্ষিণায় যে কবিতার বই ছাপার জন্যে দিয়েছেন তাও কথায় কথায় বলে ফেলেছিলেন। 'শীরি ফরিয়াদ' ও 'সর্বেশ্বর' নামে তাঁর দুটি কবিতা 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের কাছে পৌঁছিয়েছে কিনা জানতে বলেছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর পত্র প্রকাশের কথাও ওঠে। তাঁর 'শীরি ও ফরিয়াদ' কবিতা ১৩৬১ সালের কার্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তেই প্রকাশিত হয়। যার শেষ ছত্রেই লিখেছেন—

> 'এক টুকরো রুটির সঙ্গে পেয়ালাটি ভরে
> সিরাজী-মদিরা ধরনে প্রণয়ীর অধরে।

প্রতিদানে দিলেন কবি বসন্তিয়া গুল্।
এই দুনিয়া 'বেহেস্ত' হলো, ফুটলো কুঁড়িফুল।'

প্রেম যে কবির অন্তরের অফুরন্ত রসের উৎস তা জীবন-সায়াহ্নের এই কবিতাতেও ধরা দিয়েছে। কিন্তু 'সর্বেশ্বর' কবিতাটিতে সায়াহ্নের সন্ধ্যা আহ্নিকের যেন মন্ত্র-উচ্চারণ করলেন। আরম্ভের ছত্রেই বলছেন—

'যাঁর প্রকাশে সব প্রকাশে বিশ্ব যাঁহার কাব্য,
ইচ্ছাতে যাঁর সম্ভবপর সকল অসম্ভাব্য।'

এবং শেষ ছত্রে এসে বলছেন—

'বেরিয়েছে আজ, গেরুয়াবাস পরেছে তার মন,
দাও গো সাড়া প্রাণের ঠাকুর, দাও গো দরশন।
চড়ুই পাখির মতন তোমার চরণ-ধূলায় স্নান
করবো কবে? পথ চেয়ে রই, ভিক্ষা কর দান।'

নিজেকে চড়ুই পাখির মতো ভাবা এবং চরণ-ধূলায় স্নান এতো আত্মনিবেদনের বৈষ্ণবপ্রকৃতিই। আর তাই 'সর্বেশ্বর'কে ভেবেছেন—

'যাঁহা হতে সূর্য ওঠেন, যাহাতে যান অস্ত ;
তিনিই আমি, তিনিই তুমি, তিনিই তো সমস্ত।'

ভাব ও ছন্দে গভীর কবিমনীষা।

আমাদের ইচ্ছে ছিল তাঁর আসন্ন জন্মদিনেই এক সম্বর্ধনার উৎসব করা। তিনি সে প্রস্তাব সংকোচের সঙ্গেই সেদিন স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন—'আর তো তেমন লেখা হয় না। এখন নতুন কালের কবিরা বেশ লিখছে।"

—'তাঁরা তো আমাদের মধ্যে উপস্থিত থেকেই আপনাকে শ্রদ্ধা জানাবেন, সে সুযোগটা যে 'সাহিত্যতীর্থ' আশা করছে।'

কথাটা শুনে ঘরের জানলা দিয়ে তাঁর দৃষ্টি যেন সুদূরপ্রসারী হয়ে গেল। বললেন—তাই হবে। তবে এখন শান্তিপুরে যাচ্ছি, মনটা বড় চাইছে।

সেই যে মনের টানে শান্তিপুরে গেলেন, সেই যাওয়াই শেষ শান্তির পারাবারে যাওয়া হয়ে গেল। কলকাতায় জন্মদিনে তাঁর আসা হল না। তিনি শান্তিপুরেই চেয়েছিলেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে। তাতেই পেলেন কবি শান্তি।

কিন্তু কবির পরম শান্তি তাঁর কবিধর্ম ও কবিকর্মের উজ্জ্বল স্থায়িত্বে। তাই কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মশতবর্ষের উদ্‌যাপন-লগ্নে বাংলার পাঠক দরবারে তাঁর রচনাবলীর সুলভ প্রাপ্তিতেই মনে হয় যথার্থ শান্তি।

এতে কবির আত্মার চেয়ে মনে হয় কবি-অনুজদের শান্তিই বেশি। কারণ তাঁর কাছে আমাদের আর-একটি অপূরণীয় ঋণ রয়েছে, যা জাতীয় ঋণ।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সুদূর আমেরিকায়

চিকাগো শহরে পার্লিয়ামেণ্ট অফ রিলিজিয়ানস্‌য়ে ভারতীয় ধর্ম ও সাধনায় প্রবক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে তিনি সমুদ্রপথে মাদ্রাজ থেকে খিদিরপুরে আসেন। তিন বছরেরও বেশি সময় বিদেশে বেদান্ত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশে সেইসব সংবাদ আসতে থাকে। যুবসমাজ তখন ভাবে ও ভক্তিতে যে কি বিপুলভাবে অন্তরের আসনে বিবেকানন্দকে বরণ করেছিল তারই পরিচয় পাওয়া গেল খিদিরপুর থেকে শিয়ালদা স্টেশনে যখন বিশেষ রেলগাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ পৌঁছেছিলেন পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটায়। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে যাবার জন্যে একটি ঘোড়ার গাড়ি সাজিয়ে আনা হয়েছিল। প্রচুর জনসমাগম। স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনিতে শিয়ালদা স্টেশন উচ্ছল। ছাত্র ও যুবসমাজ উপস্থিত। কবি করুণানিধানও উপস্থিত হয়েছেন সতীর্থদের সঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দকে ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে সেই গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে যে ছাত্রদল সেদিন সেই গাড়ি নিজেরাই টেনে নিয়ে চলে ছিলেন তরুণ কবি করুণানিধানও ছিলেন তাঁদেরই একজন। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় সেদিনের হ্যারিসন রোডের ওপর দিয়ে শিয়ালদা স্টেশন থেকে তরুণদল ঘোড়ার গাড়ি টানছেন, যাদের মধ্যে তরুণ কবি করুণানিধান অন্যতম আর গাড়িতে বসে রয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি একটি বাড়ির দোতলার বারান্দায় দেখতে পেলেন সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে। স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত জোড় করে প্রণাম নিবেদন করছেন আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ওপরে দুহাত তুলে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। ত্রৈয়ীর অপূর্ব সংযোগ—সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ ও কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। করুণানিধানের জীবন ও কাব্য বিষয়ের গবেষক ডক্টর মদনমোহন কুমার মহাশয় তারকচন্দ্র রায়ের কাছে এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে, 'কালীনাথ রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বাগচী, তারকচন্দ্র রায় সহপাঠী ছাত্রদের লইয়া শিয়ালদহ স্টেশনে স্বামীজীর অভ্যর্থনায় যোগ দিতে যান।' এই সম্পর্কে তারকচন্দ্র বলেছিলেন—'স্বামীজীর গাড়ি টানিয়া লইয়া রিপণ কলেজে যখন আমরা আসিতেছি, দেখিলাম হ্যারিসন রোডের এক বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উর্ধ হইতে দুই হাত তুলিয়া স্বামীজীকে আশীর্বাদ করিতেছেন। গাড়ির মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বামীজী দুই হাত জোড় করিয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে প্রণাম জানাইলেন।' সে দিন রিপণ কলেজে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় সতীর্থসহ স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম বরণ করার আয়োজন করেন। সেদিন 'রিফ্লেক্টর' পত্রিকার সত্বাধিকারী নীলকমল মিত্রের পুত্রবধূ স্বামীজীকে আরতি করেন। এখন ধর্মসভায় বা সুধীসভায় এ রীতি কোথাও

কোথাও চালু থাকলেও তখন মানুষকে পঞ্চপ্রদীপাদিতে অর্ঘ্য ধরে দেবতার মতো আরতি করা হত না বা চলন ছিল না। সেদিন অভাবিত ভাবেই বলা যায় তা হয়েছিল কবি করুণানিধান-সতীর্থদের আয়োজিত স্বামীজীর প্রথম বাঙালীর দ্বারা প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায়। এর পর ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে শোভাবাজারে এক বিপুল নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানেই কবি করুণানিধান পাঠ করলেন বিবেকানন্দ-বরণ এই কবিতাটি—

'এস, এস, এস বিবেকানন্দ,
ভারতের ধ্রুব পূর্ণ চন্দ।'

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দ্বারা করুণানিধান প্রমুখ তৎকালের যুবসমাজ আমাদের পূর্বসূরি রূপে আমাদের জাতীয় ঋণ কতকাংশে সেদিন পূরণ করেছিলেন। তাঁদেরকে প্রণাম, কবি করুণানিধানকে তাঁর জন্মশতবর্ষের আলোকে প্রণাম জানাই, শুভ্র-সুন্দর মানসিকতার কবি করুণানিধানকে প্রণাম জানাই।